ড. আম্বেদকর

বনাম

গান্ধীজি

পরেশ চন্দ্র বাইন

ড. আম্বেদকর
বনাম
গান্ধীজি

পরেশ চন্দ্র বাইন

উত্তর দুর্গানগর, শহীদ বাদল সরণি,
পোঃ রবীন্দ্রনগর, কোলকাতা - ৭০০০৬৫

কিছু কথা

বাল্যকাল থেকে মাধ্যমিক পাস (১৯৮১) পর্যন্ত আমি ভারতের 'জাত ব্যবস্থা' মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, উচ্চনিচ সম্পর্ক, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ব্যাপারে একটু আধটু ধারণা লাভ করি। এসব বিষয়ে মাঝেমাঝেই মনোকোণে কতিপয় প্রশ্ন উদিত হলেও ১৯৮৪ খ্রিঃ বি.এ. (অনার্স) পাঠরতাবস্থায় আমার সম্পাদনায় বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত চাঁদা-রায়পুর অঞ্চলে 'নবদিগন্ত' নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনাকালে একটা মানবতাবিরোধী ঘটনার সম্মুখীন হই এবং উপরোক্ত বিষয়ে জানার জন্য চরম কৌতূহলী হয়ে উঠি। ঘটনাটি এইরূপ—আমাদের পত্রিকার কমিটির সভাপতি ছিলেন আমারই সমবয়স্ক এক ব্রাহ্মণ যুবক। একদিন সকাল ৯টায় পত্রিকার আর্টিকেল ব্যাপারে তাদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে ও তার বউদি তারস্বরে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল—"পরেশ বারান্দায় উঠো না, বারান্দায় উঠো না, আমার ভাইপোর উপনয়ন হচ্ছে। এ সময় কোন শূদ্রের মুখ দেখতে নেই।" ব্যস—রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে সেদিন থেকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, জাতব্যবস্থা সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করি। আজকের 'ড. আম্বেদকর বনাম গান্ধীজি' নামক পুস্তিকার আত্মপ্রকাশ তারই ফলশ্রুতি।

যাইহোক, এই গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্যাবলির মধ্যে রয়েছে বেশকিছু তথ্য, যা রূঢ় বাস্তব ঘেঁষা ও অপ্রিয় সত্যাশ্রয়ী। বহু গ্রন্থ থেকে এগুলো চয়ন করা হয়েছে। যদি কারো মনে এই গন্থে উপস্থাপিত কোন তথ্য বা তথ্যাবলি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে, তাহলে তাঁদের অনুরোধ করব—গ্রন্থগুলি দয়া ক'রে পাঠ করুন; অযথা রাগ, ক্ষোভ, সন্দেহ প্রকাশ করে কোন লাভ নেই। আমরা জানি, 'গান্ধী মিথ' বা তাঁর সম্পর্কে অতিমানবীয় ধারণা পোষণ করার জন্য তাঁর সম্পর্কে এ যাবৎ রচিত গ্রন্থাবলিতে অনেক সত্য ও অপ্রিয় কথা লেখকরা বর্ণনা করেননি। পক্ষান্তরে নিচুতলার অস্পৃশ্য সমাজের লোক ব'লে বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের জীবনে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা ও তাঁর বৃহৎ কর্মময়, সংগ্রামময় জীবনের কার্যাবলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভারতের উচুতলার লেখক, সাংবাদিক, প্রফেসররা লেখেননি বা বলেননি। তাই এই গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্য অনেকের কাছে নতুন ও অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। মনে রাখতে হবে—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সারা বিশ্বে মহাকাশ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা—এককথায় সর্বক্ষেত্রে নবনব গবেষণা শুরু হয়েছে এবং বহু অজানা তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ভারতমাতার কৃতী, প্রতিভাধর, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, দক্ষ সাংসদ, সংবিধান বিশারদ্, বিখ্যাত অধ্যাপক-পণ্ডিত, দলিত সমাজের মুক্তির দূত বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর এবং সুচতুর ও কৌশলী কংগ্রেসী নেতা গান্ধীজি সম্পর্কেও এখন নতুন নতুন নানা তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে।

এই পুস্তিকা রচনার ক্ষেত্রে আমার কৃতিত্ব উল্লেখের দাবি রাখে না। আমি কেবল as like as a bee। মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ ক'রে মৌচাকে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু মৌ পূর্ণ করে, আমিও ঠিক তেমনি গ্রন্থ থেকে গ্রন্থ ঘেঁটে এই তথ্যগুলি চয়ন করেছি।

গ্রন্থ-প্রকাশে আমার সুযোগ্যা সহধর্মিনী শ্রীমতী পদ্মা, আমার আত্মজা স্নেহের পুত্তলি পুবালি ও ভাই রতনের উৎসাহ এবং সহযোগিতা অনেকখানি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আর দুর্গানগর উত্তর বাদড়া (নেতাজী লেন)-এ অবস্থিত 'সুপার্ব কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং' সেন্টারের কর্ণধার শ্রী বিকাশ চৌধুরী মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এই পুস্তিকাটি স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হল। এজন্য তাকে হার্দিক অভিনন্দন ও ধ্যনবাদ জানাই। পত্রিকা মুদ্রণে ত্রুটি থাকলে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে বলি—এই পুস্তিকা পাঠ ক'রে যদি একজন পাঠকও কৌতূহল নিবৃত্তি করতে পারেন বা 'feel good' অনুভব করেন তাহলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

—লেখক

'মাতৃপিতৃ আশিস্'
উত্তর দুর্গানগর, শহীদ বাদল সরণি, পো ঃ রবীন্দ্রনগর, কোলকাতা-৬৫

ড. আম্বেদকর বনাম গান্ধীজি

"কেহ নাহি আসে ভবে দেব কি দানব
আচরণে শত্রু মিত্র আচরণে সুমানব।...

—কবির এই উক্তি সর্বাংশে সত্য। ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়ে একজন মানুষ তার পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্য, রাষ্ট্রীয় ও কালিক পরিবেশ থেকে রসদ সংগ্রহ করে গড়ে তোলেন জীবনদর্শন, ধর্মীয় চিন্তা, ব্যক্তিত্ব, যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পরিণত হন মহানে আর একজন হীনবৃত্তি অবলম্বন করে পরিণত হয় নরাধমে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রবল যে দুই ব্যক্তিত্ব সমধিক গুরুত্বপূর্ণ, বহুবিতর্কিত এবং পরস্পর দুই মেরুতে অবস্থিত, তাঁদের একজন হলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশে কৌশল, ছলনা, মিথ্যাচার, হিংসার আশ্রয়ে বিখ্যাত হওয়া ব্যারিষ্টার গান্ধীজি। আর অন্যজন হলেন ভারতে প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সমাজ কর্তৃক ঘৃণিত, পদদলিত, অত্যাচারিত নিন্দিত অস্পৃশ্য তথা দলিত সমাজের মুক্তির আলোকদূত, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী, বিখ্যাত পণ্ডিত, বাগ্মী, আইনজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, আইনবিশারদ, দলিত নেতা, সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা, দক্ষ সাংসদ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, সুলেখক, সৎচরিত্র, ন্যায়পরায়ন, আধুনিক 'চাণক্য', জ্ঞানতাপস, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ তৎকালীন এশিয়ার ছ'জন পণ্ডিতের অন্যতম, গণতন্ত্রের পূজারি, জাত-পাতের জগদ্দল পাথরকে আত্মবলে উৎপাটনে সচেষ্ট, বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংবিধান রচয়িতা ভারতমাতার কৃতী ও মহান সন্তান, 'ভারত রত্ন' ড. বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯১ - ১৯৫৬)। স্মরণীয় যে অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী ড. অমর্ত্য সেন একবার সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন—'Dr. Ambedkar is my father of economy জওহরলাল নেহরুও একদা আম্বেদকরের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'Dr. Ambedkar is the brightest gem in my Cabinet.'

এঁরা দু'জন জীবনের নানা সময়ে পরস্পরের মূল্যায়ন করেছেন। একদিন গান্ধীজি ড. আম্বেদকর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'He is not a man to allow himself to be forgotten'—যেনতেন প্রকারেণ ইতিহাসে নিজের স্থান করে নেওয়ার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। ড. আম্বেদকর গান্ধীজি সম্পর্কে বলেছেন, 'মুখে যার ঈশ্বরের নাম এবং একই সঙ্গে বগলে লুকায়িত ছোরা। এহেন মানুষ যদি মহাত্মা আখ্যা প্রাপ্তির যোগ্য হয়, তাহলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একজন মহাত্মা। পরবর্তীকালে একদা গান্ধীজি আম্বেদকরকে বলেছিলেন, 'You are a patriot of the sterling worth.' আপনি একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক।

এখন উক্ত দুই ব্যক্তির জীবনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করা যাক। তবে স্মরণীয় যে, এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক।

১। জন্ম ঃ

আম্বেদকর : মধ্যপ্রদেশের 'মৌ' নামক শহরে সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের তাঁবুতে ১৮৯১-এর ১৪ এপ্রিল অস্পৃশ্য মাহার জাতির সুবেদার রামজী শকপাল ও ভীমাবাঈয়ের সর্বশেষ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন আম্বেদকর। ছোটবেলার নাম ছিল ভীম। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার আম্বাবাদ গ্রামে। পিতা রামজী ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক মারাঠী। তিনি ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ এবং কবিরপন্থী, উদারচেতা ও প্রগতিশীল মানুষ। তিনি নর্মাল স্কুল থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন, মহাত্মা জ্যোতিরাও স্কুলে ছিলেন তাঁর বন্ধু।

গান্ধীজি : ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে করমচাঁদ গান্ধী ও পুতলীবাঈ-এর সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হন। করমচাঁদ গান্ধীর পরিবার ছিল জাতিতে বেনিয়া এবং গোঁড়া বৈষ্ণব। ধর্মীয় চিন্তায় উদারতার কোনও স্থান ছিল না। গান্ধীজির পিতা ও জ্যাঠা-কাকারা পোরবন্দরে রাজমন্ত্রী ছিলেন।

২। **শিক্ষা** ঃ

আম্বেদকর : আম্বেদকরের বাবা মাত্র ১৪ বছর সেনাবাহিনীর প্রধান শিক্ষকের কাজ থেকে অবসর নেন। ভীমের বয়স তখন ছ'বছর। কিছুকাল পরে পিতা রামজী শকপালি বোম্বাই প্রদেশের সাতরায় আর একটি চাকরি নিয়ে সপরিবারে সেখানে বসবাস শুরু করেন। ছ'বছর বয়সে ভীমের মা মারা গেলে তাঁর পিসিমা মীরাবাঈ তাঁকে যত্ন সহকারে মানুষ করতে শুরু করেন। সাতরার একটি স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হলে পিতাই তাঁকে মারাঠা ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ও অংক শেখাতেন। কিছুদিন পরই পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করলে ভীম মনে খুব আঘাত পান। ১৬ বছর বয়সে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আম্বেদকর বোম্বে এলফিনস্টোন কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। উক্ত কলেজ থেকে তিনি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ পাস করেন। বি.এ. পাসের মাত্র ১৫ দিন পর তিনি বরোদার মহারাজার সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্টের পদে চাকরি গ্রহণ করেন। বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড়ের আর্থিক আনুকূল্যে তাঁর পরবর্তী শিক্ষা জীবনে বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব হয়। যেমন— (ক) ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কলম্বিয়া (আমেরিকা) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ancient Indian comerse-এর ওপর M.A. Degree লাভ করেন। (খ) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D লাভ করেন। বিষয় ছিল National Dividend of India:a Historical and Analytical Study। (গ) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় Master of Science ডিগ্রী অর্জন করেন।

বিষয় ছিল provincial Decentralisation of Imperial Finance in British India. (ঘ) ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেন Doctor of Science (Ds.C) ডিগ্রী। বিষয় ছিল The problem of Rupee। (ঙ) ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের বিখ্যাত গ্রেইজ-ইন ল'কলেজ থেকে ব্যারিষ্টারী পাস করেন। এছাড়া জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কোর্স শেষ হওয়ার আগেই নানা কারণে দেশে ফিরে আসতে হয়। (চ) LLD ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, (ছ) ডি.লিট (সাম্মানিক) ১৯৫৩, সংবিধান রচনার জন্য। (জ) ভারতরত্ন ১৯৯০।

শিক্ষা ঃ গান্ধীজি : ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত গান্ধীজি পোরবন্দরে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। মাঝে ১৩ বছর বয়সে তৎকালীন সামাজিক নিয়মে তাঁকে বিবাহ করতে হয় বলে সে বছর পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পাস করেন। এরপর কলেজে কয়েক মাস পড়ার পর তিনি লন্ডনে যান ব্যারিষ্টারী পড়তে। লন্ডনে প্রথমে তাঁকে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের জন্য লন্ডন ম্যাট্রিকুলেশন কোর্স পড়ে পাস করেন। পরে দু'বছর তিনি ব্যারিষ্টারী পাসের জন্য পড়াশুনা করে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাস করে ওই বছরই দেশে ফিরে আসেন।

গ। কর্মজীবন ঃ পেশা ঃ

আম্বেদকর : গান্ধীজির তুলনায় আম্বেদকরের পেশাগত জীবনের পরিধি ছিল ব্যাপক। তাঁকে চাকরি, ব্যবসা, অধ্যাপনা, পুস্তক সমালোচনা, আইন ব্যবসা প্রভৃতিই করতে হয়েছিল। যেমন—(১) বি.এ পাসের পরই ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথমদিকে বরোদা স্টেটে কিছুদিন মিলিটারি সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি করেন, (২) ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৯২০-এর জুন পর্যন্ত সরকারি সিডেনহাম কলেজে অধ্যাপনা করেন, (৩) ১৯২০-২৩ পর্যন্ত আমেরিকা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় দফায় অধ্যয়ন, (৪) ১৯২৩-এর মাঝামাঝি সময় থেকে বোম্বের সহকারি আইন কলেজে পার্টটাইম অধ্যাপনার কাজ করেন, (৫) ১৯৩৫-এর জুন থেকে পূর্ণ এক বছর উক্ত কলেজে Principal হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গান্ধীজি : ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে এসে গান্ধীজি বোম্বে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ভালো বক্তা না হওয়ায় এবং যথেষ্ট পরিমানে সমাজ, সংসার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তিনি প্রথম দিকে মোকদ্দমার বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দান কালে তাঁর শরীর কাঁপতে শুরু করত। মুখ দিয়ে কথা বের হত না। অবশেষে মক্কেলকে টাকা ফেরত দিয়ে কোর্ট ছেড়ে চলে আসতে হত। এরপর তিনি বোম্বের হাইকোর্ট ছেড়ে রাজকোটে পুনরায় ব্যারিষ্টারী শুরু করেন। এবার কিছুটা সাফল্য আসে। এইসময় তিনি দাদাভাই নওরোজী

ও মিঃ ফ্রেডারিক পিংকাট-এর শরণাপন্ন হন। পিংকাট তাঁকে ওকালতিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য সাধারণ জ্ঞান লাভের কথা বলেন। পিংকাট তাঁকে বলেন, "তোমার সাধারণ জ্ঞান খুব কম। সাংসারিক জ্ঞানের অভাব। আর উকিলের ওটা না হলে চলে না।"

আফ্রিকায় গমন ঃ দাদা আবদুল্লা কোম্পানির বড় বড় ব্যবসা ছিল ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। কোম্পানির পোরবন্দরের ব্যবসা দেখাশোনা করতেন গান্ধীজির দাদা। কোম্পানির ৬/৭ লক্ষ টাকার একটা মামলা চলছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধীজি ওই মামলা পরিচালনার জন্য ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান।

৪। অত্যাচার অসম্মানের ঘটনা ঃ

আম্বেদকর : ব্রাহ্মণ শ্রেণি কর্তৃক সৃষ্ট অস্পৃশ্য সমাজের অন্তর্গত মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন বলেই আম্বেদকরকে ছোটবেলা থেকে উচ্চবর্ণ, উচ্চবিত্তদের দ্বারা নানা সময়ে নানাভাবে অত্যাচারিত, অপমানিত, ঘৃণিত হতে হয়েছে। যেমন—(i) প্রাথমিক পর্বের স্কুলে উচ্চবর্ণের ছেলেদের সাথে একই বেঞ্চে তাঁকে বসতে দেওয়া হত না, বসতে হত বাড়ি থেকে আনা চাটাইয়ে। (ii) ক্লাসে কথা বললে তাঁর মুখ নিঃসৃত বাষ্পে শ্রেণিকক্ষ অপবিত্র হবে—তাই তাঁকে কথা বলতে দেওয়া হত না। (iii) জাত যাওয়ার ভয়ে তাঁর খাতা শিক্ষকরা হাত দিয়ে স্পর্শ করত না। দূর থেকে খাতা দেখে দিতেন। (iv) দেবনাগরী (?) ভাষা সংস্কৃত অস্পৃশ্যদের ছেলে আম্বেদকরকে পড়তে দেওয়া হত না। (v) তেষ্টা পেলে 'জল দাও' বললে লাঠি দিয়ে পেটানো হত। তাই উপরের দিকে মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনও দয়ালু ছাত্র মুখে উঁচু থেকে জল ঢেলে দিলে তবেই আম্বেদকর পান করতে পারত। এই জঘন্য বা অমানবিক আচরণের মরুভূমিতে মরূদ্যান হিসেবে দেখা দেন এক উচ্চমনা, মানবতায় পুষ্ট, জাতপাতের ঘৃণ্য প্রথার ঊর্ধ্বেবিচরণকারী এক ব্রাহ্মণ সন্তান। যিনি সন্তান স্নেহে তাঁর ভর্তির খাতায় আম্বাবাদেকর-এর স্থলে আম্বেদকর লিখে দেন। সেই থেকে ভীম আম্বাবাদেকর হলেন ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। (vi) ভীমের বাবা যখন গোরো গাঁও-এ খাজাঞ্চির কর্মে কর্মরত, তখন একদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে তিনি ও তাঁর দাদা পাদালি স্টেশনে পৌঁছে বাবাকে খুঁজে পাননি। চিঠিতে বাবাকে ওই স্টেশনে থাকতে বলেছিল। বাবাকে না পেয়ে অগত্যা দুই স্কুল পড়ুয়া একটা গরুগাড়ি ভাড়া করে উঠে পড়ে। একসময় গাড়োয়ান বালক দু'টি অস্পৃশ্য সমাজের অন্তর্গত জানতে পেরে তখনই গাড়ি থেকে তাদেরকে ও তাদের মালপত্র নামিয়ে দেয়। অবশেষে দ্বিগুণ ভাড়া দেওয়ার কথা বললে গাড়োয়ান রাজি হয়। তবে শর্ত ছিল দুই ভাইকেই গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে হবে। তাই-ই হলো। গাড়োয়ান পায়ে হেঁটে চললো। পথে তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জোটেনি সেদিন। খাবার তো দূর অস্ত। (vii) বোম্বাই এলফিনস্টোন হাইস্কুলে ভীমকে ভর্তি করা হলে সেখানে অস্পৃশ্য বলে নানা গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করতে

হয়। টাকার অভাবে ভালো বাড়ি ভাড়া না নিয়ে পারেলের চাওয়ালে অর্থাৎ শ্রমিক বস্তিতে ভীমকে তার বাবা, মা, দাদার সঙ্গে এককামরা বিশিষ্ট ঘরে অতি কষ্টে বসবাস করতে হত। ভোরবেলা বাবা ঘুম থেকে উঠে গেলে ভীমকে পড়াশুনা করতে হত। বস্তিতে থাকতেন বলে ছাত্ররা তাঁকে নানাভাবে উপহাস করত। তবে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করলে এস. কে. বোলে নামক এক উদারপন্থী মানুষের নেতৃত্বে আম্বেদকরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অপমানিত জীবনে এটা ছিল একবিন্দু শান্তির বারি। (viii) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বোম্বের সিডেনহাম কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হলে বর্ণহিন্দু ছাত্ররা ছোটজাতের অধ্যাপক আম্বেদকরের ক্লাস বর্জন করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মীতা, পঠন-পাঠনের কৌশলে আকৃষ্ট হয়ে বোম্বাই শহরের বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা অস্পৃশ্য অধ্যাপকের ক্লাসে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে। (ix) আম্বেদকর লন্ডনের গ্রেইজ ইন কলেজ থেকে ব্যারিষ্টারি পাস করে ১৯২৩ সালে বোম্বে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করলে উচ্চবর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্য হওয়ার জন্য আম্বেদকরের কাছে মামলার জন্য যেতেন না। যেমন হয়েছিল ১৮৬৮ সালে খ্রিস্টান মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ্রেইজ ইন কলেজ থেকে ব্যারিষ্টারি পাস করে কলকাতায় ওকালতি শুরু করলে। (x) ভালো ভালো কলেজে তিনি অধ্যাপনার জন্য আবেদন করলেও কেবল অস্পৃশ্য হওয়ার জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়নি। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অপমান করা হত। (xi) অস্পৃশ্য সমাজের লোক বলে তাঁকে বহু হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। (xii) অস্পৃশ্য সমাজের লোক বলে জাতীয় নেতা নামে কথিত (বাস্তবে জাতপাতের সমর্থক) বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' পত্রিকায় আম্বেদকরের লেখা ছাপা হয়নি। (xiii) সিডেনহাম কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগদান করলেও গুজরাটি ব্রাহ্মণ অধাপকদের জন্য ব্যবহৃত জলপত্র থেকে আম্বেদকরকে জল পান করতে দেওয়া হয়নি। (xiv) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এক বর্ষার দিনে চৌদার পুকুরের মামলায় ব্যারিষ্টার হিসেবে প্রতিবাদী পক্ষের জবাব দিতে তিনি যাচ্ছিলেন বাহাদ শহরে। প্রবল বর্ষণ ও ঝড়ে খেয়া পারাপারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আম্বেদকরকে সেখানকার উচ্চবর্ণের কোনও বাড়িতে আশ্রয় ও খাদ্য দেওয়া হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, সেখানে কোনও দলিত সমাজের পরিবার ছিল না। অগত্যা তাকে প্রায় দু'দিন গাছের তলায় ভিজে ও অনাহারে থাকতে হয়েছিল। 'অমৃতস্য পুত্রা:'দের দেশ ভারতবর্ষের কী উদারতা! (xv) ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অনুন্নত শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য 'ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস এডুকেশন সোসাইটি' গঠন করেন আম্বেদকর। ওই সোসাইটির শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মে সন্তুষ্ট বোম্বাই সরকার সরকারি হোস্টেলগুলি তুলে দেয় উক্ত সোসাইটির হাতে। আম্বেদকর আর্থিক সাহায্যের জন্য বহু মানুষের আর্থিক সাহায্য পেলেও বর্ণহিন্দুরা তাঁকে সাহায্য তো করেনইনি, উল্টে তাঁকে নানা কটূ ও অপমানজনক বাক্য শুনতে হয়েছিল। তবে নিম্নবর্ণের ছাত্রদের বর্ণহিন্দু

পরিচালিত স্কুলে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে সিন্ধে ও বীর সাভারকার এক আন্দোলন করেন এবং অনেকটা সফলও হন। (xvi) ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ড. সোলাঙ্কির প্রস্তাবানুসারে নির্যাতিত শ্রেণি, আদিবাসীদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন বোম্বাই সরকার। ওই কমিটির সদস্য ছিলেন আম্বেদকর। তিনি বর্ণহিন্দুদের স্কুলে নির্যাতিতদের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে তাকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, এমনকি নানা কটূভাষা তাঁর কর্ণে প্রবেশ করে। (xvii) ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আম্বেদকর সবান্ধব যান দৌলতাবাদে; উদ্দেশ্য—সেখানকার ঐতিহাসিক স্থান ও দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দর্শন। একটা পুকুরে যখন আম্বেদকর হাত-পা ধুচ্ছিলেন, তখৰ এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁকে আর হাত-পা ধুতে দেননি। এরপর ওই অঞ্চলে আম্বেদকর যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ একজন সশস্ত্র প্রহরী তাদের সঙ্গে ছিলেন। যাতে আর কোনও পুকুরের জল অপবিত্র না করে। (xviii) একদিন এক জনসভায় আম্বেদকর যাবেন এক টাঙ্গীওয়ালার মাধ্যমে। টাঙ্গীওয়ালা অস্পৃশ্য আম্বেদকরকে তুলতে রাজি হল না, কারণ তার টাঙ্গী অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিগুণ টাকা দিতে চাইলে সে রাজি হল এবং বললেন সে টাঙ্গী টানবে না। তখন আম্বেদকরের এক অনুরাগী যুবক টাঙ্গী টানতে শুরু করে। কিন্তু অনভিজ্ঞ যুবক টাঙ্গী উল্টে ফেললে আম্বেদকরের পা ভেঙে যায়। শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি এক প্রতিবেদন রচনা করেন, তাতে লেখা হয়—হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার-আচরণ পালন করা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের মানুষরা ঘৃণ্য ক্রীতদাসদের মতো জীবনাপন করতে বাধ্য হয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের চক্রান্তে। (xix) একবার আম্বেদকর তার পতি অন্ত প্রাণ স্ত্রী রমাবাঈকে নিয়ে পান্তরপুর তীর্থে যান স্ত্রীর অনুরোধে। কিন্তু অস্পৃশ্য সমাজের নারী হওয়ায় তাঁকে দূর থেকে মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে হয়। ব্যথিত আম্বেদকর তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর হিন্দুধর্মের পারলৌকিক ক্রিয়া না মেনে মাহার পুরোহিত ডেকে যথারীতি ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেছিলেন।

এরকম আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে, যা 'অস্পৃশ্য আম্বেদকরকে' পদে পদে অপমান সহ্য করতে হয়েছে। এই অপমান কারা করেছেন? করেছেন 'অমৃতস্য পুত্রা' নামক তত্ত্বকথা প্রচারকারী, বিভেদকামী, সংকীর্ণমনা পুরোহিত শ্রেণি।

গান্ধীজি : আম্বেদকরের তুলনায় খুব কমসংখ্যক বার গান্ধীজিকে অপমানিত হতে হয়েছে। আর গান্ধীজি অপমানিত হত বিদেশে দক্ষিণ আফ্রিকায়, আম্বেদকর অপামনিত হয়েছে তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষে, তাঁরই হিন্দুধর্মের বর্ণবাদীদের কাছে। তাই আম্বেদকরের বেদনা অনেক বেশি। (i) দাদা আবদুল্লা ও প্রতিপক্ষ শেঠ তৈয়বের মধ্যে ব্যবসা সক্রান্ত মামলা চলছিল। মোকদ্দমার ব্যাপারে গান্ধীজি প্রিটোরিয়ার উদ্দেশে নাতাল থেকে ট্রেনে করে যাত্রা করেন। ট্রেনে তিনি প্রথম শ্রেণির টিকিট কাটলেও গার্ড এসে তাঁকে 3rd class

এগিয়ে বসতে বলেন। কারণ ভারতীয়রা মানেই ছোট জাত। গান্ধীজি অরাজি হলে মন্ত্রিবর্গ স্টেশনে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর জিনিসপত্র প্লাটফর্মের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রচন্ড শীতের রাতে তাঁকে স্টেশনে কাটাতে হয়। এরপর তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি প্রথম শ্রেণিতেই যাওয়ার অনুমতি পান। (ii) এরপর বাস যাত্রা। বাসের টিকিট থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজিকে বাসের ভিতরে বসতে দিল না, পাদানিতে বসতে বলা হল। পাদানিতে বসতে রাজি না হলে বাসের চালক গান্ধীজিকে প্রহার করে। শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের মধ্যস্থতায় প্রহার বন্ধ করা হয়। (iii) এরপর আবার ট্রেনজার্নি। প্রথম শ্রেণির টিকিট থাকা সত্ত্বেও গার্ড তাকে নামিয়ে দিতে চাইলে গাড়ির এক ইংরেজ যাত্রীর ধমকে গার্ড বলেন, "আপনি যদি একজন কুলির সঙ্গে যেতে চান, তাহলে আমার তাতে আপত্তি নেই। (iv) ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি একবার ভারতে আসেন। ওই বছর ডিসেম্বরে কুইরল্যান্ড ও নাদেরীয় নামক দু'টি জাহাজে যাত্রী ছিল। জাহাজ থেকে নামার সময় গান্ধীজিসহ কয়েকজন যাত্রীকে দক্ষিণ আফ্রিকার লোকজন পুলিস প্রচন্ড প্রহার করে। পুলিস সুপারিনটেন্ডেন্টের স্ত্রী তাঁর ছাতার আড়ালে তাঁকে কোনওরকমে রক্ষা করেন।

৫। জীবন সংগ্রাম ঃ প্রথম ধাপ—

গান্ধীজি : ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মামলা পরিচালনার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন গান্ধীজির জীবনে একটি টার্নিং পয়েন্ট। সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের ওপর শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা সংগঠিত নানা অত্যাচার, অপমান, নাগরিকত্বের সমস্যা, শ্রমের মজুরির সমসায় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মনোনিবেশ করেন। ডারবানে, ট্রান্সভালে, জোহানেসবার্গে প্রায় ২১ বছর ধরে ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার্থে গান্ধীজি আন্দোলন পরিচালনা করেন এই পর্বে তাঁকে ভারতের রাজা, মহারাজা, বিত্তবান, রক্ষণশীল, বণিক প্রভৃতি শ্রেণি অর্থ পাঠিয়ে সাহায্য করেন। তারা তাঁকে তাদের নেতা রূপে মেনে নেন। তিনি নাতালে গঠন করেন 'Indian Congress'। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা তাঁকে তাঁদের নেতার সম্মান দেন। এইভাবে ১৮৯৪-১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বিশেষ করে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বৈষম্যমূলক ব্যবহারের অনেকটাই বিলোপ করেন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯০৪ খ্রষ্টাব্দে জোহানেসবার্গ থেকে ৪৮০ কিমি দূরে ডারবানে যাওয়ার সময় (ট্রেনে করে) গান্ধীজির বন্ধু মি. হেনরী পোলক তাঁকে রস্কিনের 'Unto the Last' নামক গ্রন্থটি পড়তে দিয়েছিলেন। ডারবানে পৌঁছাতে যে ২৪ ঘণ্টা সময় লেগেছিল, গান্ধীজি সেই সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি পড়ে শেষ করেন। এই গ্রন্থের সত্যাগ্রহ তত্ত্ব কথার সঙ্গে গীতা, বাইবেল, মহাভারত, রামায়ণ, বুদ্ধের জীবন ও বাণী প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের সমন্বয়ে গান্ধীজি তার নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে তোলেন। যাইহোক

ট্রান্সভালে ভারতীয়রা ও নিগ্ররা রাত ৭টার পর রাজপথে বের হতে হত লাইসেন্স নিয়ে। ওটা দেখাতে না পারলে তাকে গ্রেপ্তার করা হত। গান্ধীজি এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৯৪০ সালে জোহানেসবার্গে ভয়ংকর প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে তিনি তাঁর সেবাদল নিয়ে রোগীদের শুশ্রূষার কাজে নেমে পড়েন। তবে এই সেবামূলক কাজে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং নিজেই তিনি জল, মাটি, গাছ, গাছড়ার সাহায্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করার জন্য 'স্বাস্থ্যরক্ষা' নামে একটি বইও রচনা করেন।

আম্বেদকর : জীবনচলার নানাক্ষেত্রে উচ্চবর্ণ, উচ্চবিত্তদের দ্বারা বারে বারে নির্যাতিত, অপমানিত, ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হওয়ার ঘটনাবলি আম্বেদকরকে দারুণভাবে আঘাত করে। তিনি চিন্তা করেন—বিগত প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে অর্থাৎ আর্যদের ভারতে আসার পর নয়টি অবতার সহ তেত্রিশ কোটি দেবতা, কয়েক শত গুরু, মহামানব আবির্ভূত হয়েছে বলে ব্রাহ্মণ সমাজ প্রচার করে আসছে। তারা কত ভালো ভালো কথা, মানবতার বাণী, স্বর্গ-নরকের ব্যাখ্যা, পাপ-পুণ্যের তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ভারতে পুরোহিত শ্রেণি কর্তৃক সৃষ্ট সেই অস্পৃশ্য বা দলিত হিন্দুদের জীবন-মানের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। তাঁদের কেউই এই অমৃতস্য পুত্রাঃদের (?) হীন বা করুণদশা অবলোকন করে ব্যথিত হননি বা তাঁদের কঠিন হৃদয় এতটুকু বিগলিত হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে অস্পৃশ্য সমাজ শিক্ষা, সম্মান, অধিকার, স্বাস্থ্য, মনোবল থেকে বঞ্চিত হয়ে জড় ভারতে পরিণত হয়েছে। তাই মানবতার পূজারি আম্বেদকরের হৃদয় ক্রন্দন করে ওঠে তাদের হতশ্রী বিশিষ্ট জীবন ও মুখমণ্ডল দর্শন করে। তিনি তাঁদের নবউষার স্বর্ণদুয়ারে উপনীত করে তাদের জীবনের মান ও মূল্যারোপের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন। সাড়ে তিন হাজার বছর এই হীন পতিতদের ভগবানরূপে আম্বেদকরের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ ঘটল। এবার আসা যাক আম্বেদকরের সেই মানবসেবামূলক মহতী কর্ম প্রচেষ্টা বর্ণনার দিকে।

আম্বেদকর জানতেন শিক্ষাহীন জাতি মেরুদন্ডহীন কাপুরুষ। তাই তিনি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে দলিতদের মধ্যে চেতনা বিস্তারের কথা ভাবেন। এজন্য তিনি বরোদার মহারাজা শাহুর (শিবাজীর পরবর্তী বংশধর) অর্থানুকূল্যে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি প্রকাশ করেন মারাঠি পাক্ষিক পত্রিকা 'মূকনায়ক'। সেখানে তিনি হিন্দুধর্মের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে। বর্ণব্যবস্থার ক্ষতিকারক দিক, হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার গলদ, জাতীয় জীবনের দুর্বলতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তার কুফল ইত্যাদি নেতিবাচক দিকগুলো তিনি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর কয়েক মাস পূর্বে তিনি কেলেগাঁও এস্টেটের মানগাঁওয়ে, কয়েক মাস পরে নাগপুরে আয়োজন করেন নির্যাতিতদের সম্মেলন। তিনি অস্পৃশ্যদের মধ্যেকার বিভিন্ন বিভাগ বা শ্রেণির মধ্যে

যোগাযোগ করেন, উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও ঐক্য গড়ে তোলা। তিনি তখন ১৮টি শ্রেণিকে একতাবদ্ধ করন। এই সময় তিনি নিপীড়িত দলিতদের বজ্রগর্ভ আহ্বান জানান। তারা যেন কুসংস্কার দূরে করে শিক্ষিত হওয়ার ও পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব গড়ে তোলার দিকে মনোযোগী হয়। এই সময়ই তিনি সমগ্র মহারাষ্ট্রে ধ্বনি তোলেন—Educate (শিক্ষিত করো), Agitate (আন্দোলন করো) ও organise (সংগঠন গড়ে তোলো) । তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, অস্পৃশ্যতা দূর না করলে ভারতে প্রকৃত জাতীয়বাদ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ১৯২৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভা'। এতে তিনি দলিতদের বলতেন, অস্পৃশ্যরা যেন কুসংস্কার পরিত্যাগ করে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করে। সে সময়ে তিনি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দলিতদের জীবিকার উন্নয়নে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করা, নির্যাতনের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করা ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

১৯২৫ সালে সোলারপুর ও বেলগাঁও-এ দু'টি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ছুটে বেড়িয়েছেন দলিতদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতার বাণী প্রচার করতে। এর কিছুদিন পর তিনি 'সমতা' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'জনতা' নামে আর একটি পত্রিকা। এইভাবে মহারাষ্ট্রে তাঁর চিন্তাচেতনার প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবমূর্তি, ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে; তিনি হয়ে ওঠেন দলিত জনতার বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী।

৬। রাজনৈতিক নেতারূপে আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপট ঃ

গান্ধীজি : ১৯১৫ সালে গান্ধীজি দেশে ফিরে এসে তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের পরামর্শ মাথায় নিয়ে—(ক) ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারের চম্পারণে নীল চাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, (খ) ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের খেদা জেলায় কৃষকদের ওপর সরকারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, (গ) ১৯১৮ সালে গুজরাটের আমেদবাদে শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির সপক্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে সফল হন। এইভাবে তিনি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে পরিচিত করানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

আম্বেদকর : ১৮৯১ থেকে ১৯২৩ সালে পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২/৩৩ বছর ব্যাপী আম্বেদকর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ওপর বর্ণহিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারের স্বরূপ দর্শন করে মর্মাহত হন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে ও অস্পৃশ্য সমাজের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। আর এই সময়ে একটি ঘটনা তার অন্তরে অগ্নিসংযোগ করে। ঘটনাটি হলো—১৯১৮ সালের মার্চ মাসে বোম্বাইতে বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের উদ্যোগে নির্যাতিত মানুষের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিলক অস্পৃশ্যতাকে একটি চরম অন্যায় বলে ঘোষণা করে বলেন, "স্বয়ং ঈশ্বরও

যদি অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করেন তাহলে আমি তাঁকে ঈশ্বর বলে মানি না।" তখন সভায় করতালির ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। এই সময় হঠাৎ একজন প্রস্তাব দেন—"এই মর্মে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক যে, সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ এখন থেকে সকলেই ব্যক্তিগত জীবনে অস্পৃশ্যতা বর্জনকরে চলবেন।" কিন্তু স্বয়ং তিলক প্রস্তাবে স্বাক্ষরদানে অসম্মতি জানান। এই হল মেকী, ছদ্মবেশী ভারতের জাতীয় নেতা তিলক। আসলে মহারাষ্ট্রের কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক-বাহক তিলকের বাইরে ও ভেতরে দু'টি স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল।

এই ঘটনায় আম্বেদকর বিস্মিত, মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হন। তিনি সিংহবিক্রমে প্রতিজ্ঞা করেন, অস্পৃশ্য সমাজের উন্নয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। আর এইসব ভন্ড কংগ্রেসী নেতাদের মুখোশ খুলে ফেলবেন। তিনি হিন্দু সমাজের নির্যাতিত, অশিক্ষিত, দুর্বল, ক্ষুধার্ত মানুষদের নামকরণ করেন Depressed classes। তিনি দীর্ঘকাল ব্যাপী তাদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি self respect (আত্মসম্মান), self help (আত্মনির্ভরতা) ও self elevation (আত্মউন্নয়ন) এই তিনটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড ঘোষণা : ১৯১৮ সালের জুলাইয়ে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, ভারতে একটি অধিকতর শক্তিশালী ও চতুর শ্রেণি অস্পৃশ্য শ্রেণির ওপর কঠোর ও নির্মম অত্যাচার, শোষণ চালিয়ে আসছে। ১৯১৯ সালের প্রথমদিকে সাউথবরো কমিটি ড. আম্বেদকরসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের উপরোক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আহ্বান জানান বক্তৃতা দিতে। তখন ড. আম্বেদকর ও কর্মবীর সিন্ধে সভায় নির্যাতিত শ্রেণির প্রকৃত অবস্থা নিখুঁতভাবে বক্তব্যে তুলে ধরলেন। তিনি নির্যাতিত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচন ও সংখ্যানুপাতিক সংরক্ষিত আসনের দাবি জানান। কমিটি সেদিন হিন্দু সমাজব্যবস্থায় নির্যাতিত শ্রেণির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে নেন। আর ওইদিন থেকেই আম্বেদকর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি নির্যাতিত শ্রেণির অবিসংবাদিত নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনানুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভায় গভর্নর জেনারেল মোট ১৪ জন সদস্যের মধ্যে একজন নির্যাতিত শ্রেণি থেকে মনোনীত করেন। মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় ৪ জন। বোম্বাইতে ২ জন, বাংলায় একজন, উত্তরপ্রদেশে একজন মনোনীত হন, মাদ্রাজে ৭টি নির্যাতিত শ্রেণির ১০ জন প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার অর্জন করে। এই সময় আইনের দ্বারা নির্যাতিত শ্রেণিগুলির রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে, যা ড. আম্বেদকরের আন্দোলনের স্বর্ণফসল।

১৯২৭ সালে আম্বেদকরের কর্ম পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে হত তাঁকে। তিনি সর্বত্রই নির্যাতিত সমাজকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কথা বলতেন, আর বলতেন তারা যেন অন্যায়-অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, "Lost rights are never regained by begging and by appeals to the conscience of the usurpers but by relentless struggle goats are used for sacrificial offering and not lions." অর্থাৎ লুপ্ত অধিকার ভিক্ষায় মেলে না। প্রবঞ্চকের বিবেকের দ্বারে আবেদন জানিয়ে অধিকার আদায় করতে হয়—বিরামহীন সংগ্রামের দ্বারা। দেব পূজায় ছাগলকেই বলি দেওয়া হয়, সিংহকে নয়। ১৯২৭ সালে বোম্বে বিধান পরিষদে আম্বেদকরকে মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য করে নিলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নির্যাতিতদের ভাগ্যাকাশে নবসূর্যোদয় হয়। ফলে সাড়ে তিন হাজার বছর পরে দেবভূমি (?) ভারতে অসহায়দের পক্ষে কথা বলার সুযোগ পান ড. আম্বেদকর।

চৌদার পুকুর অভিযান : ব্রহ্মার মুখ থেকে জাত ব্রাহ্মণ শ্রেণি, ব্রহ্মার পদ থেকে সৃষ্ট শূদ্র শ্রেণিকে দীর্ঘ সাড়ে তিন হাজার বছর ব্যাপী চৌদার পুকুরের জল স্পর্শ, পান করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। এটা নাকি ঈশ্বরেরই নির্দেশ—এমনই প্রচার করে আসছিল ব্রহ্মার সুসন্তানেরা। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত পুকুরের জল স্পশ ও পান করতে পারতেন বর্ণহিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, পারসিক সম্প্রদায়। ঈশ্বরের কী অপূর্ব বিধান! এক চরম বৈষম্যমূলক বিধান। ১৯২৩ সালের আগস্টে বোম্বাই আইনসভায় এস. কে. বোলের প্রস্তাবানুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এখন থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দু তথা অস্পৃশ্যরা জলাশয়, পানস্থান, কুয়ো, ধর্মশালা, বিদ্যালয়, কোর্ট-কাছারি, অফিস, চিকিৎসালয়ে প্রবেশ ও ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু বর্ণহিন্দুদের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনির ভয়ে নির্যাতিতরা চুপ করে থাকে। ড. বি আর আম্বেদকর ১৯২৭ সালের ১৯ ও ২০ মার্চ চৌদর পুকুর অভিযানের ব্যাপারে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে দশ হাজার দলিত সমবেত হয়। আম্বেদকরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার বিখ্যাত জলাশয় চৌদার পুকুরে পৌছান, সাথে মুক্তি আকাঙ্ক্ষী দশ হাজার মানুষ, বর্ণহিন্দুদের ভীতি উপেক্ষা করে আম্বেদকর উক্ত পুকুরের জল স্পর্শ ও পান করেন। সঙ্গে অসংখ্য মানুষও। ভারত ইতিহাসে সেদিন বর্ণহিন্দুদের অহমিকা, তাদের শাস্ত্র ও তাদের ঈশ্বরও পরাজিত হল আম্বেদকরের এই মানবতার জয়গান গাওয়া আন্দোলনের কাছে। বিকেলের দিকে অধিকাংশ লোক বাড়ি ফিরে গেলে বর্ণবাদীদের গুন্ডাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে মাহাদের মাটি ও চৌদার পুকুরের জল অস্পৃশ্যদের লালরক্তে রঙিন হয়ে উঠল। সেদিন বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও কিশোরের প্রাণ অকালে ঝরে গেল। লড়াকু আম্বেদকর দমলেন না। তিনি আইনের আশ্রয়ে গুন্ডাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। বর্ণবাদীরা কোণঠাসা

হয়ে পড়ল; মহারাষ্ট্রসহ সারা ভারতে আম্বেদকরের নাম ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পরদিন বর্ণহিন্দুরা পুকুরের জল তথাকথিত 'শুদ্ধ' করতে গোমূত্র, গোবর, দুধ, দধি ও পূজার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ১৯২৭-এর ৪ আগস্ট মাহাদ পৌরসভা বর্ণহিন্দুদের কাছে মাথা নত করে অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রত্যাহার করে নেয়। সেদিন কি ঈশ্বর অলক্ষ্যে থেকে হেসেছিলেন, না কেঁদে ছিলেন, তা কে বলবে?

মন্দিরে প্রবেশ ঃ চৌদার পুকুরের আন্দোলন দিকে দিকে মৌচাকে ঢিল ছোঁড়ার মতো জনজাগরণ সৃষ্টি করে। ১৯২৭-এর ২১ আগস্ট অমরাবতীর অম্বাদেবী মন্দিরে দলিতরা প্রবেশের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। এরপর ১৯২৯ সালে পুনের পার্বতী মন্দিরে প্রবেশের জন্য অস্পৃশ্যরা সত্যাগ্রহ করে। ১৯৩১ সালে বি. কে. গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে নাসিকের কলারাম মন্দিরে শুরু হয় সত্যাগ্রহ। আর কেরলের গুরুভাযা মন্দিরে দলিতরা কেল্লাপ্পনের নেতৃত্বে বর্ষব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলে আম্বেদকর বলতেন, রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি আসলে ছিলেন একজন অস্পৃশ্য। আম্বেদকর বিশ্লেষণ করে দেখান—বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখান—কী অপকৌশলে, হীন ৳ক্রান্তে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে অস্পৃশ্যতার পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করে রেখেছে। তিনি কংগ্রেসী নেতাদের বলেন, এইসব শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি, তাতে লিখিত অসাম্যের নীতি মেনে চলে মুখে সামাজিক সাম্যের দাবি এক সঙ্গে চলতে পারে না। এ নীতি আসলে বৃক্ষের মূল কর্তন করে পত্রে জল সিঞ্চনের মতো অসারকার্য। উক্ত সম্মেলনের শেষে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক এবং সমাজে জাতপাতকে জিইয়ে রাখার পক্ষে মহাগ্রন্থ মনুসংহিতাকে আম্বেদকর আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেন। (২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৭ সালে)। এই দিনটি আম্বেদকর ও অস্পৃশ্যদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ধনঞ্জয় কীর তাঁর 'Dr. Ambedkar life is Mission' গ্রন্থে এই দিনটিকে Red Letter Day বলে অভিহিত করেছেন।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতে আর্যদের রচিত অসংখ্য পুরাণ, সংহিতা থাকতে ড. আম্বেদকর কেন মনুসংহিতা দাহ করলেন? ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। আজ থেকে প্রায় ২০০০ হাজার বছর পূর্বে রচিত মনুসংহিতায় জাতপাত ব্যবস্থা, আর্য-অনার্য বিভাজন, শূদ্রদের সম্পর্কে নানা কটূ ও হীন বর্ণনা স্থান লাভ করেছে। এই গ্রন্থে লিখিত বিবরণগুলিকে আর্যরা এবং পরবর্তীকালে ভারতের ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, কায়স্থরা সত্য বা অভ্রান্ত বলে মনে করেন। ভারতে দলিত বা শূদ্রদের ওপর যত অমানবিক অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি মূলত এই গ্রন্থের বিষয়কে সত্য বলে আঁকড়ে ধরার জন্যই। মানবতা বিধ্বংসী, সমাজ বিভাজন বা ছোটবড় ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী এই গ্রন্থকে তাই আম্বেদকর চরম ঘৃণা করতেন। কী আছে এই গ্রন্থে? এখানে সেইসব তথ্য ও তত্ত্বকথার ২/৪টি দিক বর্ণনা

করলাম। বিস্তারিত বর্ণনার জায়গা এখানে নেই। যেমন—(১) শূদ্ররা বেদ পাঠ করলে, স্পর্শ করলে তাকে হত্যা করা হবে, তার অঙ্গচ্ছেদ করা হবে, (২) শূদ্ররা পূজা করলে তার দেহে গরম লোহার শলাকা বিদ্ধ করতে হবে, (৩) একজন ১০ বছর বয়স্ক ব্রাহ্মণকে একজন ৯০ বছর বয়স্ক শূদ্র প্রণাম করবে, (৪) শূদ্র লেখাপড়া শিখলে বা শিখতে চাইলে, মন্ত্র উচ্চারণ করলে তার জিহ্বা কেটে ফেলা হবে, (৫) শূদ্ররা ঘরে অস্ত্র রাখতে পারবে না, (৬) শূদ্ররা ধনসম্পত্তির মালিক হতে পারবে না, (৭) শূদ্ররা আরামপূর্ণ জীবনযাপন করতে চাইলে বা করার কথা বললে শারীরিক অত্যাচার করা হবে ইত্যাদি। এই গ্রন্থ পাঠ করলে যে কোনও মানবতাপুষ্ট মানুষেরই মন ক্রোধে ফেটে পড়বে। অথচ যুগ যুগ ধরে ভারতের অল্পসংখ্যক মানুষ এইসব কথাকে সত্য ও অবশ্য পালনীয় বলে মনে করে আসছে। যদিও এখন সেই সংখ্যাটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ড. আম্বেদকর ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্র ও পুরাণ সংহিতা ইত্যাদি পাঠ করে উপলব্ধি করেছিলেন, মনুসংহিতাই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের শেষ ধাপে নিয়ে এসেছে। তাই পুরোহিত শ্রেণির কাছে 'অমৃত' তুল্য এই গ্রন্থটাকে নিয়ে কয়েক হাজার অনুগামী নিয়ে ২৫ ডিসেম্বর (১৯২৭) দাহ করেছিলেন।

রাজনৈতিক জীবন ঃ

আম্বেদকর : এইসময় আম্বেদকর উপলব্ধি করেন, এইসব সামাজিক আন্দোলন অপেক্ষা দরিদ্রদের একতাবদ্ধ করে রাজনৈতিক আন্দোলন করা শ্রেয়। তিনি বললেন, 'রামচন্দ্রের চেয়ে রুটিচন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেশি।' শুরু হল রাজনৈতিক আন্দোলন। বেদনার বৃন্তে ফোটা বিষাদসিন্ধুর জলে নিমজ্জিত, চিররঞ্জিত, ঘৃণিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বলতেন, 'যার কিছু নেই, সে দরিদ্র, আর যারা সমাজে কিছুই নয়, তারা দলিত।'

পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত; গৌতম বুদ্ধের সাম্যের বাণীতে উদ্বুদ্ধ, মার্কস-এঙ্গেলস-এর সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আম্বেদকর ফরাসি বিপ্লবের ত্রয়ী বাণী স্বাধীনতা (Liberty), সমতা (Equality) ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণী (Fraternity) তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন।

সাইমন কমিশন ও আম্বেদকর ঃ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ১৯২৮ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি সাইমনের নেতৃত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট 'সাইমন কমিশন' ভারতে আসেন। কোনও ভারতীয় প্রতিনিধি কমিশনে না থাকায় ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি 'Go Back Simon' ধ্বনি দিতে শুরু করে। কেবল অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়ে কংগ্রেস প্রায় সবশ্রেণির মানুষদের নিয়ে 'অখিল ভারতীয় সম্মেলন' আহ্বান করে। সম্মেলনের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় মতিলাল নেহরুর ওপর। তাতে নির্বাচনে অস্পৃশ্যদের অংশগ্রহণের কথা বাদ দিয়ে মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধি গ্রহণ করার কথা

বলা হয়। কিন্তু সাইমন কমিশন সব প্রদেশের আইন পরিষদের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। আম্বেদকরের বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভার পক্ষ থেকে সংরক্ষিত আসনে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা ও বোম্বাই আইনসভার ১৪০টি আসনের মধ্যে ২২টি অস্পৃশ্যদের জন্য দাবি করা হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আম্বেদকর গণতন্ত্রের পূজারি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর ১৯৩০ সালে পেশ হওয়া সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনে হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবে একটি অপমানজনক দিক ছিল—নিম্নবর্ণের কোনও হিন্দু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে তাকে গভর্নরের কাছ থেকে certificate নিতে হবে। এতে ক্রুদ্ধ আম্বেদকর প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নাগপুরে ১৯৩০-এর আগস্টে বলেন যে, কোনও দেশের ওপর বিদেশি শাসন যেমন মেনে নেওয়া যায় না, তেমনি কোনও এক জাতি বা বর্ণের ওপর আর এক জাতির বা দেশের শাসনকেও মেনে নেওয়া যায় না গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষের মূল্যকে স্বীকার করতে হবে ভারতের নিম্নবর্ণের মানুষও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে।

গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বলেছিলেন আগে স্বাধীনতা, পরে সামাজিক সংস্কার প্রোগ্রাম; কিন্তু আম্বেদকর বলেছিলেন, দলিতদের পক্ষে আগে প্রয়োজন মানবিক ও সামাজিক মূল্য, মন্দিরে প্রবেশাধিকার, অস্পৃশ্যতা বর্জনের মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব, পরে স্বাধীনতা। এরপরই দলিত সমাজ তাঁকে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গোলটেবিল বৈঠক ঃ ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিষয়ে আলোচনা করতে ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ডে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। এই আলোচনার ভিত্তিতেই ভারতীয়দের ক্ষমতা হস্তান্তর ও অন্যান্য বিষয় স্থির করা হবে বলা হয়। পরপর তিনটি গোলটেবিল বৈঠক বসে; (১) ১৯৩০-এর ১২ নভেম্বর, (২) ১৯৩১-এর ৭ সেপ্টেম্বর ও (৩) ১৯৩২-এর ১৭ নভেম্বর। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের তিন সপ্তাহ পূর্বে আম্বেদকর ব্রিটিশ জনমতকে দলিতদের পক্ষে আনতে লন্ডনে পৌঁছে যান। লন্ডনের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ভারতের দলিত শ্রেণির ওপর বর্ণহিন্দুদের সীমাহীন শারীরিক, মানসিক অত্যাচারের করুণ ও মর্মস্পর্শী কাহিনি অবগত করান। মোট ৮৯ জন সদস্যের মধ্যে ইংল্যান্ডের তিনটি রাজনৈতিক দলের ১৬ জন সদস্য ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত রাজ্যগুলি থেকে রাজা জমিদারদের ২০ জন প্রতিনিধিও ছিলেন। এছাড়া কংগ্রেস ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর ৫৩ জন প্রতিনিধি উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উদারপন্থী নেতাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজবাহাদুর সপ্রু, জয়াকর,

শীতলাবাদ। জিন্না, ফজলুল হক, আগা খাঁ ছিলেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ। শিখদের প্রতিনিধি ছিলেন উজ্জ্বল সিং, হিন্দু মহাসভার পক্ষে ছিলেন ড. মুঞ্জে এবং বরোদা, ভূপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের নৃপতিদের পক্ষে ছিলেন স্যার রামস্বামী প্রমুখ। সারা ভারত দলিত-অস্পৃশ্য সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর ও তাঁর সহযোগী রায়বাহাদুর শ্রীনিবাসন। এই প্রথম দীর্ঘকালব্যাপী অমানবিক আচরণের শিকার, দলিত, শোষিত মানুষরা জন্মভূমিতে কিছু অধিকার লাভ ও শাসন কার্যে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্ব আলোচনা সভায় যোগদান করেন, যা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও মাইলস্টোন রূপে চিহ্নিত।

১৯৩০-এর ১২ নভেম্বর থেকে ১৯৩১-এর ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথম গোল টেবিল বৈঠক চলে। ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ বৈঠকের উদ্বোধন করেন এক ভাব গম্ভীর পরিবেশে; বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। বৈঠকে ভারতের বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধিই স্বায়ত্তশাসন মূলক 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তবে কতিপয় মুসলিম নেতা দাবি করেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে যেমন অন্যান্য রাজ্যের সমমর্যাদা দিতে হবে, তেমনি সিন্ধু অঞ্চলকে পৃথক রাজ্য রূপে মেনে নিতে হবে।

বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু বৈঠকে ড. আম্বেদকরের উপস্থাপিত বক্তব্যে তাঁর অসাধারণ মেধা, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা প্রকাশিত হয়। সেদিন ভারতের নানা সমাজের নেতৃবৃন্দ, ইংল্যান্ডের মন্ত্রীবর্গ আম্বেদকরের স্বরূপ জেনে ও উপলব্ধি করে বিস্মিত হয়েছিলেন; আর তাঁর এই গুণাবলির কথা লন্ডনের সংবাদপত্রগুলি প্রথম পেজে প্রকাশ করেন; তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেদিন তিনি কেবল ভারতের অনুন্নত শ্রেণির নেতা নন, একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

বৈঠকে ড. আম্বেদকর ভারতের জনসংখ্যার $^{১}/_{৫}$ (৬ কোটি) অংশের প্রতিনিধি হিসাবে অনুন্নত, দলিত শ্রেণির ঘৃণ্য, অসম্মানজনক জীবনালেখ্য বর্ণনা করেন। তিনি দলিত সমাজের করুণকাহিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে বলেন যে, এতকাল ব্রাহ্মণ্য শাসিত বা মনুশাসিত ভারতবর্ষে দলিতরা হীন জীবনযাপন করেছে। এখনো করছে। আর প্রায় ১৭৫ বছর ব্যাপী ব্রিটিশরা ভারত শাসন করলেও দলিতশ্রেণির কোনোরূপ উন্নতি সাধিত হয়নি। তারা অতীতে যে ঘোরান্ধকারময় পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করত, আজও সেই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকেও কোন সুযোগ সুবিধা পায়নি, পায়নি কোন মানবিক সম্মান। অথচ ইংরেজ জাতি বিশ্বে প্রকাশ করেন, তাঁরা সুসভ্য জাতি; শিক্ষিত ও মানবতার পূজারি জাতি, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে আন্দোলন করা

জাতি। কিন্তু সেই ইংরেজ জাতি ভারতের দলিত সমাজের কাছে এইসব মতবাদের কোন্‌টা বা কোন্‌গুলি বাস্তবে তুলে ধরেছেন? আম্বেদকর জোরের সঙ্গে আরো বলেন যে, লন্ডনে বক্ষে ইংরেজরা ভারতবাসীকে দমিয়ে রাখতে পারবেন না, ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য সংবিধান ব্যতীত যে ব্যবস্থাই ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করুক না কেন, তা স্থায়ী হবে না। ভারতের দলিতরাও স্বায়ত্তশাসন কামনা করে।

বৈঠকে ভারতের বেশিরভাগ প্রতিনিধিই স্বায়ত্তশাসন মূলক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু জিন্না বলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে অন্যান্য রাজ্যের সমান মর্যাদা দিতে হবে এবং সিন্ধুপ্রদেশকে পৃথক রাজ্য হিসাবে মেনে নিতে হবে। সভায় আম্বেদকর বাগ্মীতা, পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশের জন্য ভূয়োসী প্রশংসিত হন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে, ভারতবাসীকে ইংরেজরা জোর করে দমিয়ে রাখতে পারবেন না। ভারতের জনগণের ১/৫ (৬ কোটি) অংশ হল হরিজন। বৃটিশ শাসনে পূর্বে ও পরে তাদের দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। ব্রিটিশ রাজত্বেও তারা কোনওরূপ সুযোগ, সুবিধা পায়নি। ভারতের দলিতরাও স্বায়ত্তশাসন চায়। সেনাবাহিনীতে ও অন্যান্য চাকরিতে ব্রিটিশ সরকার দলিতদের নিয়োগ করছেন না।

সম্মেলনের ৯টি সাবকমিটির আট-টিতেই আম্বেদকরকে সদস্য করা হয়। এটা তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা তথা পাণ্ডিত্যের জন্যই হয়। ভোট সংক্রান্ত ফ্রান্সাইজ সাব কমিটিতে তিনি দলিতদের পৃথক নির্বাচনী ক্ষেত্রের দাবি করেন এবং বলেন, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতের অধিকাংশ জনগণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। তিনি মৌলিক অধিকারের ঘোষণাপত্র রচনা করে দেশের অন্যান্য নাগরিকদের সাথে দলিত সমাজের মানুষের সমানাধিকার দাবি করেন। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা থেকে অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন ও দলিতদের ওপর থেকে সরকারি ও সামাজিক সবধরণের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে বৈষম্য দূর করার দাবিও তিনি প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে তোলেন। এখনে স্মরণীয় যে, গোলটেবিল বৈঠকের তিন মাস পূর্বে গান্ধীজি আম্বেদকরকে ডেকে এক আলোচনা সভায় বসে বলেন যে, তিনি অস্পৃশ্যতার বিরোধী। কিন্তু তিনি বর্ণবিভাগ মানেন। কারণ বর্ণবিভাগ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। তখন আম্বেদকর তাঁকে বলেন যে, অস্পৃশ্যতা আর বর্ণ বিভাগ একটি টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। দুটোই ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত। লন্ডনের সংবাদপত্র আম্বেদকরকে কেবল অনুন্নত শ্রেণির নেতা নন, একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বৈঠক ব্যর্থ হয়। কারণ মুসলিম নেতাদের দাবি হিন্দু নেতারা মেনে নিলেন না;অন্যদিকে মুসলিম নেতারা অনুন্নত শ্রেণির দাবি মেনে নিলেন না। কারণ তাঁরা ভাবলেন যে, দলিতদের দাবি-দাওয়া মেনে নিলে তারা শক্তিশালী হয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করে মুসলিমদের দাবির বিরোধিতা করতে পারে।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলেও এই প্রথম বিশ্ববাসী ভারতের দলিতদের প্রকৃত দুরবস্থার কথা জানতে পারলেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে ১৯৩১-এর ৭ সেপ্টেম্বর। এই বৈঠকে গান্ধীজি, মহম্মদ ইকবাল, সরোজিনী নাইডু, শিল্পপতি জি. ডি. বিড়লা, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। বৈঠকে গান্ধীজি নিজেকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবি করলে আম্বেদকরের সঙ্গে প্রকাশ্য বাদানুবাদ শুরু হয়। যাইহোক সংখ্যালঘুদের সমস্যার কোনও সর্বসম্মত সমাধান বেরিয়ে না আসায় র‍্যামাজ ম্যাকডোনাল্ড বললেন, তিনি নিজে এই সমস্যা সমাধানের উপায় বের করবেন। যদি সব সদস্যই তাঁকে এ ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করেন। আম্বেদকরই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ম্যাকডোনাল্ডের দাবি না মেনে বললেন, তাঁর দাবিগুলির নামমাত্র পরিবর্তনও তিনি চান না। তাই দ্বিতীয় বৈঠকও ব্যর্থ হল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল থেকে ফিরে এলে আম্বেদকরকে ভোটাধিকার কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে আহ্বান জানান সরকার। সারাদেশে ঘুরে দেখলেন—নির্যাতিত শ্রেণির সব মানুষই পৃথক নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে। ১৯৩২ সালের মাঝামাঝিতে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর সব সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে বীর সাভারকার তাঁকে বিপুলভাবে সমর্থন করেন। ভোটাধিকার কমিটিতে আম্বেদকর বলেন, হিন্দু সমাজে যাদের অস্পৃশ্য বলা হয়, তারাই নির্যাতিত শ্রেণি। আম্বেদকরের প্রভাবে কমিটি বিশেষ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেন নির্যাতিত ও অনুন্নত শ্রেণির মানুষদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে বা কোনওরূপ বয়কট আন্দোলন করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারানুসারে তারা দণ্ডিত হবেন।

পুনাপ্যাক্ট ঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২-এর ১৫ আগস্ট সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার নীতি ঘোষণা করে বলেন, প্রাদেশিক আইনসভায় নির্যাতিতরা পৃথক নির্বাচনে দু'টি করে ভোট দিতে পারবেন;একটি সাধারণ প্রার্থীকে, অন্য ভোটটি নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে। ওই রায়ে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ ও ইউরোপীয়দের অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে সংসদীয় রাজনীতিতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ল। গান্ধীজি এর বিরুদ্ধে যারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করলেন। গান্ধীজির প্রাণ বাঁচাতে নেতাজী, জওহরলাল সহ বহু নেতা আম্বেদকরকে চাপ দিতে থাকেন। তিনি সম্মতি না দিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাঁটোয়ারার রায় পরিবর্তন করবেন না। আম্বেদকর সম্মতি না দিলে তাঁকে হত্যা করা হবে কংগ্রেস থেকে বলা হয়। অবশেষে গান্ধীজির সঙ্গে আম্বেদকর যারবেদা জেলে দেখা করে বললেন, আপনি যদি অস্পৃশ্যদের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে পারেন তবে আমরা

আপনাকে আমাদের নেতা হিসাবে মেনে নেব। কিন্তু গান্ধীজি তাতে রাজি না হয়ে অস্পৃশ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণে রাজি হলেন। অনিচ্ছুক আম্বেদকর পুনাচুক্তিতে সই করলে গান্ধীজি সই করলেন না, সই করলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবদাস গান্ধী। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি কার্যকরী হলে অস্পৃশ্যদের যেতে হত না উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে নির্বাচনের সময়। কিন্তু গান্ধীর কূটকৌশলে তা হল না। আর এখনো নিম্নবর্ণের হিন্দুরা রাজনীতিতে কৃপার পাত্র। তাদের ব্যবহার করে উচ্চবর্ণের লোক ভোটে জিতে নিম্নবর্ণের স্বার্থ আন্তরিকভাবে দেখে না।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩২-এর ১৭ নভেম্বর) ও ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন প্রয়োগের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ খ্রিঃ ব্রিটিশ সংসদের উভয় কক্ষের এক যৌথ কমিটিতে ভারতের ২৫ জন প্রতিনিধি নেওয়ার কথা বলেন। আম্বেদকরকে অভ্যর্থনা কমিটিতে মনোনীত করতে চাইলে বর্ণহিন্দুদের বাধাদানের ফলে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। বর্ণহিন্দুরা পুনাচুক্তি মেনে নির্বাচন করতে না চাইলে আম্বেদকর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে চার্চিলের সঙ্গে বাদানুবাদ করে জয়ী হন। পুনাচুক্তি মতো নির্বাচন করতে বর্ণহিন্দুরা বাধ্য হন।

১৯৩৬ খ্রীঃ আম্বেদকর Independance Workers Party গঠন করেন এবং ১৯৩৭-এর নির্বাচনে ১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন সদস্য নির্বাচনে জয়ী হন এবং আম্বেদকর বিপুল ভোটে জয়ী হন। বোম্বাই আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত আইনসভার পুনাঅধিবেশন আম্বেদকর কোঙ্কন অঞ্চলে প্রচলিত গরিব মজুরদের শোষণকারী খোটা প্রথা বন্ধ করতে একটি বিল আনলেও ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তা বাতিল করে দেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ উক্ত আইনসভায় তিনি পরিবার পরিকল্পনার জন্য একটি বিল উত্থাপন করলে সেটা কংগ্রেস সরকার বাতিল করে দেয়। এই সময় তিনি বেশ কয়েকটি জেলায় খেতমজুরদের নিয়ে আন্দোলন করেন। ১৯৩৮-এর ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি মহারাষ্ট্রের মানমদে ২০ হাজারেরও বেশি শ্রমিকদের সমাবেত সম্মেলনে তিনি বলেন, শ্রমিক শ্রেণির দু'টি প্রধান শত্রু—একটি ধনতন্ত্র ও অন্যটি ব্রাহ্মণ্যবাদ। এই সময় তিনি Trade Union Leader হয়ে ওঠেন। এই সময় বোম্বাই আইনসভা শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিয়ে Industrial Dispute Bill আনলে আম্বেদকর ও যমুনাদাস মেহতা একসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা মিরাজকর এস. এস. ডাঙ্গে, নিম্বকর পারুলেকর প্রমুখকে নিয়ে Council of Action গঠন করে ১৯৩৮-এর ৬ নভেম্বর কামগর ময়দানে সমবেত আশি হাজার শ্রমিকদের নিয়ে ধর্মঘট করেন।

শ্রমবিভাগের সচিব (শ্রমমন্ত্রী) ঃ ১৯৪২ - ৪৬ খ্রিঃ আম্বেদকর ব্রিটিশ ভারতে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের শ্রমবিভাগের সচিবের দায়িত্ব পান। তিনি পাস

করান—(১) কয়লা শ্রমিকদের শিক্ষা ও গৃহনির্মাণের ও অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা, (২) চাকুরিরতা মেয়েদের ১৬ সপ্তাহ (মাতৃত্ব জনিত) সবেতন ছুটি, (৩) এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, (৪) শিল্প ও কারখানার শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজের স্বীকৃতি ও সবেতন ছুটি ব্যবস্থা, (৫) ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের সম্প্রসারণ, (৬) শ্রমিকের মৃত্যু হলে বা আহত হলে পরিবারের সদস্যদের এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা, (৭) শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ, (৮) স্বাস্থ্য-বীমার প্রবর্তন, (৯) নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ করলে অতিরিক্ত মজুরির সংস্থান করা, (১০) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে মজুরি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। তাঁর এই চার বছরের শ্রমমন্ত্রিত্বের সময় ছিল ভারতীয় শ্রমিক মুক্তির এক Golden Period। অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে বলতে হয়—ভারতের শ্রমিক শ্রেণির দুর্ভাগ্য তাদেরকে এই সত্য গোপন রেখে একশ্রেণির ভণ্ড ও জাতপাতে বিশ্বাসী নেতা দেশদ্রোহিতার কাজ করছেন। মিথ্যাচার গুরুতর অপরাধ।

তপসিলি ফেডারেশন ঃ ১৯৪২ খ্রিঃ ক্রিপস মিশন ভারতে এসে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সদস্যদের সঙ্গে আম্বেদকর দেখা করতে গেলে তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করেন তিনি কি শ্রমিক নেতা, না দলিত নেতা? এ প্রশ্নে বিব্রত বোধকারী আম্বেদকর ১৯৪২-এর ১৮ ও ১৯ জুন নাগপুর মোহন পার্কে কয়েক হাজার সমবেত অনুগামীদের নিয়ে All India Scheduled Caste Federation গঠন করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—রাজনৈতিক দিক দেখা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সারাভারত ব্যাপী সংগ্রাম ও আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। নানা স্থানে তপসিলি মহিলা সম্মেলন ও সমতা সৈনিক দল-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণীয় যে, কার্লমার্কস শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব প্রচার করেন আর আম্বেদকর জাতিভেদ ও বর্ণবিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ও জীবন উৎসর্গ করেন।

ধর্মান্তর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঃ ১৯১৭ খ্রিঃ - ১৯৩৪ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭/১৮ বছর ধরে অস্পৃশ্যদের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করে আম্বেদকর দেখলেন যে বর্ণহিন্দুদের চক্রান্তে ও অপপ্রচারে তেমন কিছু আদায় করতে পারেননি। তাই তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ নেই, এমন ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেন। তখন বৌদ্ধ, শিখ, মুসলিম প্রভৃতি ধর্মের লোকেরা তাঁকে নানারূপ অফার দিতে শুরু করলেন। হিন্দুমহাসভার প্রধান বীর সাভারকার তাঁকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ না করতে অনুরোধ করেন। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাঁকে নিষেধ করেন। এককথায় তাঁর এই ধর্মান্তর গ্রহণের সিদ্ধান্ত সারা ভারতকে সুপ্তোঘিত সিংহের গর্জনের ন্যায় গর্জে উঠতে সাহায্য করেছিল। পরে তিনি বললেন, আপাতত এই সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন। তবে এই সময় তিনি দুঃখ করে নৃতাত্ত্বিক সত্যতত্ত্ব ব্যক্ত করে বলেন, জাতপাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে

ভারতে উন্নত ও সবল বংশধারা সৃষ্টির পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কারণ বিবাহ্ পদ্ধতি জাত-বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ফলে রক্তের মিশ্রম কম হওয়ায় উন্নত মস্তিষ্ক বিশিষ্ট সন্তান ভারত তেমন সংখ্যায় পায়নি।

এর আগে ১৯৩৬ খ্রিঃ মে মাসে বোম্বাই শহরের দাদরে এক ধর্ম সম্মেলনে ভাষণে আম্বেদকর বলেন, (১) যে ধর্ম সাধারণ মানুষকে হীন ও অস্পৃশ্য বলে তাকে ঘৃণা করে, তার ব্যক্তিগত, বৌদ্ধিক, শিক্ষাগত দিকের উন্নয়নে বাধা দেয় তাকে কি ধর্ম বলা যায়? (২) যে ধর্ম এক বিশাল অংশের মানুষকে শিক্ষা ও ধনসম্পদ অর্জন ও অস্ত্রধারণ করতে দেয় না সেটাকে কি ধর্ম বলা যায়? (৩) যে ধর্ম এক বিশাল অংশের মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখতে চায় সেটা কি ধর্ম, না বিভাজন মন্ত্র ছড়িয়ে দেবার কর্মক্ষেত্র। সেদিন হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল, কোনও উত্তর দিতে পারেননি।

১৯৩৭ খ্রীঃ-এর আগস্টে বোম্বাই বিভধানসভা মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ৫০০ টাকা করলে আম্বেদকর বলেন, দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মানদণ্ড অনুসারে মন্ত্রীর ৭৫ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। ১৯৩৮ খ্রিঃ আম্বেদকর ল'কলেজের চাকরি ছেড়ে দেন পার্টির সাংগঠনিক কাজে বেশি সময় দেওয়ার জন্য। এইসময় মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ড. থারে মন্ত্রিসভায় একজন তপসিলিজাতির প্রতিনিধিকে নিতে চাইলে মনুবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী মহান নেতা (?) গান্ধীজি বললেন, হরিজন মন্ত্রীর প্রয়োজন নেই। ১৯৩৯ খ্রিঃ-এর প্রথম দিকে লন্ডন থেকে ফিরে ভাইসরয় লিনলিথগো ঘোষণা করলেন, যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হবে। তাতে দেশের করদ রাজ্যগুলি যোগ দিলেও তাদের আলাদা কোনও দায়িত্বশীল সরকার থাকবে না। মনোনয়নের ভিত্তিতে রাজ্যগুলি তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে কেন্দ্র। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র মুসলিম লিগ, আম্বেদকর প্রতিবাদ জানান, আম্বেদকর জোরালো যুক্তি দিয়ে ভাইসরয়ের প্রস্তাবকে নাকচ করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বললেন, 'My own sympathies were with England and France from the purely humanitarian standpoint... I am not, therefore just now thinking of India's deliverance. It will came but will it be worth, if England and France fail আর্থাৎ এ যুদ্ধে আমার সহানুভূতি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের দিকে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা এখন আমি মোটেই ভাবছি না। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স যদি স্বাধীনতা হারায়, ৭০ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিয়ে কী হবে? এই হচ্ছে ছদ্মবেশী, ব্রিটিশের চর গান্ধীর উক্তি! যাইহোক গান্ধীজি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করতে চাইলে জিন্না ও আম্বেদকর প্রতিবাদ জানান। আম্বেদকর বলেন—দু'টি শর্তে ইংল্যান্ডকে সাহায্য করা যেতে পারে—(১) যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে, (২) তাহলে

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থেকে ইংল্যান্ডের সহায়তায় ভারত নিজে উন্নতি সাধন করবে। এই ধরনের সংকট উপস্থিত হলে নেতাজী বোম্বাইতে এসে জিন্না, সাভারকার ও আম্বেদকরের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন। অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে নেতাজী আম্বেদকরের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারলে বৈঠক ব্যর্থ হয়। এইসময় ১৯৪০-এর শেষের দিকে আম্বেদকর তাঁর 'Thoughts on Pakistan' গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় লেখেন যে, মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিতে দুই দফায় গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হবে, কারা পাকিস্তান চায়, কারা চায় না। তারপর ওই প্রদেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের জন্য সীমানা কমিশন তৈরি করে জেলাওয়ারি ভাগাভাগি হবে। তারপর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সেই জেলাগুলি নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র হোক, একথা শুনে গান্ধীজি সহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আম্বেদকরকে ব্রিটিশের দালাল বলেন। কিন্তু একথা সত্য—এটা ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। এরপরই ১৯৪১ - ৪৬ সাল পর্যন্ত আম্বেদকর ভাইসরয়ের দরবারে শ্রমমন্ত্রী হন। এই ইতিহাস পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪২-এ ভারতছাড় আন্দোলনের পর গান্ধীজি ২১ দিনের অনশনে বসেন। তখন কংগ্রেস আম্বেদকরের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন, কিন্তু গান্ধীজি যেহেতু অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু বলেননি, তাই আম্বেদকর তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন।

এরপর ১৯৪৬-এ মন্ত্রীমিশন তার রায়ে অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি মেনে না নিলে তপসিলি ফেডারেশন কমিশনকে কালোপতাকা দেখান। এরপর স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আমেদকরকে তার মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী করেন। আম্বেদকর ৪ বছর ২ মাস মন্ত্রিত্ব করার পর ১৯৫১-এর ২৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এর একাধিক কারণ ছিল—(১) আহম্বদকরকে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো হিসাবে ব্যবহার করা, (২) তপসিলিদের প্রতি প্রতিশ্রুতি মতো নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া, (৩) ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতি; সমাজতান্ত্রিক শিবির (রাশিয়ার নেতৃত্বে চালিত) ও ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শিবির (আমেরিকার নেতৃত্বে চালিত)—এ দুটোর কোনোটাকেই নেহরু গ্রহণ না করায় ভারত প্রকৃষ্ট বন্ধু রাষ্ট্র পায়নি। তৎকালীন সংগৃহীত বার্ষিক রাজস্বের বেশিরভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করা হত (৩৫০ কোটির মধ্যে ১৮০ কোটি) কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীরের জন্য নেহরু সর্বশক্তি ও মাত্রাতিরিক্ত অর্থ নিয়োগ করেন। তাই এই সমস্যা সমাধানে তিনি কাশ্মীরকে ভাগ করার কথা বলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল দেওয়া হোক ভারতকে আর মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল পাকিস্তানকে—ঠিক ভারত ভাগের বেলায় আমরা যা করেছি। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শোনেননি। আম্বেদকরের পদত্যাগের প্রধান কারণ হল—নেহরু কর্তৃক হিন্দুকোড বিলপাস করানোর কথা বলে চার বছর পর ধরে টালবাহানা করার পর তা পাস না করানো। ১৯৪৭-এর ১১ এপ্রিল সংসদে বিলটি পেশ

করা হয়। নেহরু প্রথমে জোর দিয়ে বলেন, ওই বিলটি পাস করতেই হবে। কিন্তু মনুসংহিতার ও প্রাচীন শাস্ত্রের নিয়মকানুন, সামাজিক অসাম্যমূলক নীতিতে বিশ্বাসী বর্ণহিন্দু M.P. ও মন্ত্রীদের হুমকির কাছে মাথা নত করে নেহরু ১৯৫১-এর ২৬ সেপ্টেম্বর বিলটি পরিত্যাগ করা হল বলে জানিয়ে দেন। তাই অপমানিত, ক্ষুব্ধ আম্বেদকর সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। প্রশ্ন হল—কী ছিল এই বিলে? বিলে ছিল—মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতার ও সমানাধিকারের বিষয় ইত্যাদি। আইনসভার সভাপতি—রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, মদনমোহন মালব্য এই বিলের বিরোধিতা করে বলেন, নারীদের এইসব অধিকার দিলে হিন্দু সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐতিহ্যপূর্ণ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে এন. ভি. গ্যাডগিল, কৈলাসনাথ কাটজু ও মহিলা সদস্যরা এই বিল সমর্থন করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ খ্রীঃ ক্যাবিনেট মিশন তার রায়ে অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি না মানলে তপসিলি ফেডারেশনের সদস্যরা পুনায়, ওয়ার্ধাতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা তখন আম্বেদকরের নিজের চেষ্টায় স্থাপিত 'সিদ্ধার্থ কলেজে' তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। আলোচনা ফলপ্রসূ হল না। এরপরই গণ-পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ আম্বেদকরকে গণপরিষদে ঢুকতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তপসিলিনেতা যোগেন মন্ডলের চেষ্টায়তিনি গণপরিষদের জন্য নির্বাচিত হন। এবার সংবিধান রচনার জন্য জওহরলাল ও সরোজিনী নাইডু ব্রিটিশ আইনজ্ঞ স্যার আইভর জেনিংসকে আনতে চাইলে ইংরেজদের পরামর্শে গান্ধীজি ড. আম্বেদকরকে নিয়োগ করেন। কী চমৎকার ইতিহাসের ঘটনা গান্ধীজির আজীবনের পয়লা নম্বর শত্রু আম্বেদকরকে নিয়োগ করা হল সংবিধান রচনার মতো মহতী কর্মে। ড. আম্বেদকর হলেন খসড়া কমিটির সভাপতি।

যে গান্ধীজি লক্ষ লক্ষ টাকা অফার দিয়েও একদিন আম্বেদকরকে কংগ্রেসের দলভুক্ত করতে পারেননি, সেই আম্বেদকরকে গান্ধীজিই সংবিধান রচনার কমিটিতে স্বহস্তে নিয়োগ করলেন। গান্ধীর চরকা শোভিত তেরঙ্গা পতাকা আম্বেদকরের প্রবল আপত্তিতে হল মহামতি অশোকের অশোকচক্র।

ধর্মান্তর গ্রহণের ইতিহাস ঃ

ড. আম্বেদকর ১৯১৭ খ্রিঃ - ১৯৩৪ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় ১৭ বছর ধরে অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রভৃতি বিষয়ে অধিকার আদায়ের জন্য বর্ণহিন্দু, মনুশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিঃ তিনি উপলব্ধি করলেন যে, বর্ণহিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ শ্রেণির চক্রান্তে আন্দোলন করেও কিছুই আদায় করতে পারেননি। এতে অর্থ ও শক্তি দুয়েরই অপচয় হয়েছে এবং হচ্ছে। তখন

তিনি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্যকোন ধর্মগ্রহণের কথা চিন্তা করেন। যে ধর্মে অস্পৃশ্যতার অভিশাপে সারাজীবন মৃতবৎ, জড়ভরতের মতো বাস করতে না হয়—এমন ধর্মই তিনি অনুসন্ধান করছিলেন। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ১৯৩৫-এর ১৩ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের ইয়োলাতে উপস্থিত ১০ হাজার অনুগামীদের সামনে দীর্ঘ দু-ঘণ্টার বক্তৃতায় ধর্মান্তরের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত বেদনার সাথে বলেন, তিনি জন্ম নিয়েছেন অস্পৃশ্য হিন্দু ঘরে। ব্রাহ্মণরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে দেবেন না। তবে এটাও ঠিক যে, তিনি হিন্দু হিসাবে মরবেন না। তিনি অনুগামীদের বলেন যে, অস্পৃশ্যদের হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে কোনরূপ শক্তিক্ষয় করা বা কোনরূপ প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করে হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণ পালন করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণরা হিন্দু বলে মানেন না। স্বাভাবিক মানবিক সম্মানটুকুও দেন না, ছায়া মাড়ান না, স্পর্শ হলে নানারূপ অত্যাচার করেন। তাহলে এই নিষ্ঠুর, অমানবিক, আচার সর্বস্ব, মানবতা ধ্বংসকারী, Divide and rule নীতি সর্বস্ব হিন্দু ধর্মে নামে মাত্র 'হিন্দু' হিসাবে থাকার সার্থকতা কোথায়?

আম্বেদকরের এই সিদ্ধান্তের কথা প্রচারিত হলে সারাভারত সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় জেগে ওঠে। এ যেন মৌচাকে ঢিল ছোঁড়া। যাইহোক—এই অবস্থায় অহিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে। কারণ এইবার হিন্দুধর্মের পতন হবে! এইসময় মুসলিম নেতা কে. এল. গৌড়া, বোম্বাইয়ের এক গির্জার বিশপ, বেনারসের বৌদ্ধদের মহাবোধি সোসাইটি; পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আম্বেদকরকে আহ্বান জানান তাঁদের ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে। তাঁরা তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষায় রইলেন। এদিকে গান্ধীজি তখন বিবৃতি দেন—"ধর্ম তো বাড়ি বা পোশাকের মতো নয় যে, ইচ্ছে করলেই পাল্টে ফেলা যায়।" রত্নগিরি থেকে বীর সাভারকার আম্বেদকরকে ধর্মান্তরিত হতে নিষেধ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে কেবল মহারাষ্ট্রের সাভারকারই ড. আম্বেদকরের নীতিকে সমর্থন করতেন। কারণ, বীর সাভারকার চাইতেন অস্পৃশ্যদের প্রতি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মনোভাব, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, ঘৃণা-অবহেলা দূর হোক, অস্পৃশ্যদের বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে হিন্দু ধর্মকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাক। স্মরণীয় যে, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আম্বেদকরকে ধর্মান্তরিত হতে নিষেধ করেন। এদিকে এক সিন্ধি হিন্দু নিজের রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে আম্বেদকরকে জানান যে, তিনি যদি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেন, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। উচ্চমনা কতিপয় হিন্দু নেতা আম্বেদকরকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে বিবেচনা করার কথা বলেন। আম্বেদকর তখন 'wait and see' নীতি অবলম্বন করে বললেন, আপাতত আগামী পাঁচ বছরের জন্য এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হল। আম্বেদকরের মনে হল—তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের সিদ্ধান্তকে

কেন্দ্র করে সারা ভারত যেভাবে আলোড়িত হল, আগামী পাঁচ বছরে হয়তো নিষ্ঠুর হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্যদের জন্য তাঁর কাঙ্ক্ষিত পথাবলম্বন করবে। তখন না হয় ধর্মান্তর গ্রহণের সিদ্ধান্ত চিরতরে বন্ধ করা হবে। কিন্তু হায়! মনুশাসিত হিন্দুদের তো তাঁদের দেবতা বা ভগবান চোখ রাঙিয়ে বলে দিয়েছেন, খবরদার, অস্পৃশ্যএদর ভাগ্যোন্নয়ন করলে তোরা মার খাবি!

১৯৩৬ খ্রিঃ লাহোরে অনুষ্ঠিত "জাতপাত তোড়ক মন্ডল"-এর বার্ষিক সম্মেলনে আম্বেদকরকে সভাপতিত্ব করতে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু উক্ত মন্ডলের কতিপয় নেতার বাধাদানের ফলে সভায় আম্বেদকরের ভাষণের কপি কেড়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই বক্তৃতার কপিই 'জাতথ্যবস্থার অবলুপ্তি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ধর্মান্তর গ্রহণ ঃ মনুশাসিত নিষ্ঠুর ও মানবতা বিধ্বংসী নির্যাতনে নির্যাতিত অস্পৃশ্য সমাজকে মুক্ত করতে ঈশ্বরহীন, বর্ণহীন মানবিক ধর্ম বুদ্ধ ধর্মে ১৯৫৬ খ্রিঃ ১৪ ও ১৫ অক্টোবর, তিন লক্ষ দলিত মানুষকে নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

মৃত্যু ঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ-এর ৬ ডিসেম্বর। প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক যোগ দিয়েছিলেন তাঁর শোক মিছিলে। এরপূর্বে ভারতবর্ষে এত লোকের সমাগম হয়নি। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য সহ বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি তাঁর মরদেহে মাল্য দান করেন।

আম্বেদকরকে টাকার অফার ঃ

এইসময় কোনও একদিন গান্ধীজির অনুগামী যমুনালাল বাজাজ ও শেঠ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের মতো ধনী ব্যক্তিরা গান্ধীজির সঙ্গে আম্বেদকরের সাক্ষাৎ করান। প্রথমে ওয়ার্ধা এবং পরে সেগাঁওয়ে (সেবাশ্রম) আম্বেদকর-গান্ধীজির সাক্ষাৎ হয়। গান্ধীজি আম্বেদকরকে বলেন যে, তিনি যদি গান্ধী শিবিরে যোগ দেন তাহলে তাঁকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হবে। কিন্তু যাঁর দেহ-মন-প্রাণ হাজার হাজার বছর ধরে ঘৃণিত দলিতদের মুক্তির জন্য নিবেদিত, তিনি কি পারেন ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধ করতে? পারেন না। তাই তো সেদিন আম্বেদকর গান্ধীজির কু-প্রস্তাবে রাজি হননি। আম্বেদকরের সেদিন ফিরে যাওয়ার সময় হাজার হাজার অস্পৃশ্য তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেয়। এটা দেখে উপস্থিত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বলেছিলেন, গান্ধীজি তো হরিজনদের উন্নয়নে আন্দোলন করেন, কিন্তু গান্ধীজির ডাকে হরিজনরা এভাবে সাড়া দেয় না।

'জাতব্যবস্থার অবলুপ্তি' নামক গ্রন্থে অম্বেদকর লিখেছেন, চারবর্ণের তত্ত্বকথা চরম ভ্রান্ত। যা উচ্চবর্ণের মস্তিষ্ক প্রসূত;এটা আবার এঁরা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। কী মিথ্যাচার। আসলে যে শিক্ষা আনে চেতনা, মানুষকে দেয় সবল মেরুদন্ড, মস্তিষ্ককে করে যুক্তিবাদী, ধারালো, সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে ভারতের ৮৫ শতাংশ লোককে দাস বানিয়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা দেশের সম্পদের বেশিরভাগ আরামে আয়াশে ভোগ

করার চক্রান্ত করেন। গান্ধীজিকে আম্বেদকর সেবাগ্রামে বলেছিলেন, সোনার পাথরবাটি যেমন অবাস্তব, তেমনি বর্ণ ব্যবস্থা অটুট রেখে অস্পৃশ্যতা দূর করাও অসম্ভব ব্যাপার। তাই গান্ধীজি বর্ণব্যবস্থার সপক্ষে থেকে অস্পৃশ্যতাকেই চিরকালীন প্রথায় পরিণত করছেন।

গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবন ঃ গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫ খ্রিঃ এ দেশে ফিরে এসে ১৯১৭ খ্রিঃ বিহারের চম্পারণে নলচাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার ১৯১৮ খ্রিঃ গুজরাটের খেদামেলায় কৃষকদের ওপর সরকারের অত্যাচার ও আমেদাবাদের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি না করার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ফলে ভারতীয় রাজীনতিতে ঘটে তার আত্মপ্রকাশ। এরপর ১৯১৯-এর ৬ এপ্রিল রাওলাট আইন, ১৯১৯-এর শেষদিকে খিলাফৎ আন্দোলন, ১৯২০ খ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-এর মার্চ. লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন, (১৯৩০-৩১)। দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩২-৩৪) প্রভৃতি ক্ষেত্রে গান্ধীজি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ গান্ধীজি কংগ্রেসের সদস্যপদ পরিত্যাগ করে হরিজন আন্দোলনে যোগদান করেন। এরপর দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর জাতীয় আন্দোলনে তিনি নিষ্প্রভ ছিলেন। ১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনে তিনি সক্রিয় হন। যাইহোক— স্থানাভাবে পূর্ণ বিবরণ দিতে পারলাম না। তবে স্মরণীয় যে, গান্ধীজির মত ও পথে চলার ফলে ভারতীয় স্বাধীনতা বিলম্বিত হয়েছে। যখন আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হয়েছে, তখনই তিনি তা বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে ইংরেজ সরকার হাঁফছেড়ে বেঁচেছেন। ইংরেজরা ভারতে তাঁদের টিকে থাকার জন্য গান্ধীজির ভূমিকাকে সেভ্‌টি বাল্‌ভ... বলে উল্লেখ করেছেন। বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্যসেন প্রমুখের আন্দোলনের পর ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে বলেছেন, আর বেশিদিন তাঁরা ভারতে শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারবেন না। আর ১৯৪৬-এ নৌ-বিদ্রোহের পরের দিনই তাঁরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অতএব ভারত গান্ধীজির জন্য স্বাধীন হয়নি—এটা দেশি-বিদেশি পণ্ডিতরা স্বীকার করেছেন।

দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ঃ

(১) অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে ঃ

বিশ্বের প্রায় সব ধর্মের মধ্যে একাধিক বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—বৌদ্ধদের মধ্যে থেরবাদী ও মহাজনী, খ্রিস্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট, মুসলমানদের মধ্যে সিয়া, সুন্নী, কাদিয়ানি, আহমদিয়া, ওয়াহবি রাহাই ও যমিন ইত্যাদি। অনেকে হয়তো বলবেন, হিন্দুধর্মে জাত ব্যবস্থা আছে। এতে এমন কী ক্ষতি হল? এর উত্তরে বলা যায়, উপরোক্ত বিভাগগুলো সৃষ্টি হয়েছে মূলত মতবাদকে ভিত্তি করে। কিন্তু

হিন্দু সমাজের মধ্যে যে জাত ব্যবস্থা আছে, তা উঁচু-নিচু, ছোট-বর ধারণা থেকে আর এই এই উঁচু নিচুর কাঠামোটা হিন্দুশাস্ত্রে পুরোহিত শ্রেণি অভ্রান্ত সত্য বলে বর্ণনা করেছেন। এটা উলম্ব আকারে রয়েছে; যার উপরে আছে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তার নিচে ক্ষত্রিয় বা রাজা, তার নিচে বৈশ্য ও সর্বনিম্নে রয়েছে শূদ্র বা দলিত (অস্পৃশ্য)। একে একটা বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করা যায়; যাতে ওঠা-নামার কোনও সিঁড়ি নেই। যে যে তলায় বাস করছে, তাকে চিরকাল সেখানে বাস করতে ও মরতে হবে। অন্য কোন ধর্মে স্বধর্মীকে স্পর্শ করলে মানুষ অপবিত্র হয়ে যায় না, বা জাত যায় না। কিন্তু অস্পৃশ্যতা রূপ বিষবৃক্ষ বিশিষ্ট হিন্দুধর্মে একইরকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন পালন করা সত্ত্বেও দলিতদের স্পর্শ করলে তথাকথিত ওপরওয়ালাদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) জাত যায়। এটাই এই ধর্মের অমানবিক, অগণতান্ত্রিক প্রথা। 'গান্ধী ও আম্বেদকর' নামক গ্রন্থে অতীন ঘোষ লিখেছেন, "সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্য সমাজের সঙ্গে হিন্দুদের এখানেই পার্থক্য। বলা চলে হিন্দুরা এক ভিন্ন পৃথিবীর জীব।"

গান্ধীজি বলেছেন, "Varnashram is an integral part of Hinduism" — বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর অস্পৃশ্যতা নিবারণের আর এক নাম সমাজ সংস্কার। তিনি ১৯২১ খ্রিঃ ৬ অক্টোবরে একটি প্রবন্ধে লেখেন—(ক) বেদ, পুরাণ, উপনিষদ এবং হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে যা কিছু চলছে, আমি তার সব কিছুই বিশ্বাস করি। সুতরাং আমি অবতার ও পূর্বজন্ম মানি। (খ) **জাত ব্যবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে।** (গ) আমি বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস করি আমার মতে যা খাঁটি বৈদিক, তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম। (ঘ) আমি মূর্তি পূজায় অবিশ্বাস করি না।

অন্যদিকে ড. আম্বেদকর তাঁর রচিত 'জাত ব্যবস্থার বিলোপ'; 'শূদ্র কারা', 'মি গান্ধী ও অস্পৃশ্য সমাজের মুক্তি' ইত্যাদি গ্রন্থে যা বলেছেন, তাহল—(ক) বর্ণাশ্রম অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অদূরদর্শিতাপূর্ণ ব্যবস্থা, যা মেনে নিলে হিন্দু সমাজের সংস্কার করা অসম্ভব। (খ) জাত ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা বর্ণ ব্যবস্থা রূপ বিষবৃক্ষের দুটি নিমফল, বর্তমানে অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের পক্ষে মানসিক ব্যাধি। (গ) জন্মসূত্রে বর্ণ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হয়ে মুখে প্রগতির কথা বলার অর্থ ভন্ডামি ছাড়া কিছু নয়। (গান্ধীজি বর্ণাশ্রম মেনেই হিন্দু ধর্মের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, এটা ভ্রান্ত পন্থা)। (ঘ) হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা কেবল পুরুষদের জন্য, নারীদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়, কারণ শাস্ত্রকারদের মতে নারী মাত্রেই 'শূদ্রানী'। (ঙ) যুগ যুগ ধরে ভারতের রাজনৈতিক অধঃপতনের মূলে রয়েছে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা। তাই দেখা গেছে, রাজনৈতিক ঐক্য ভারতে কোনদিন যথার্থ অর্থে গড়ে ওঠেনি। সে জন্য বিদেশি আলোকজান্ডার, শক, হুন, পাঠান, মোগল ও সর্বশেষে ইংরেজরা সহজে বা অতিসহজে (ভারতবাসীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে) ভারতকে পদানত করেছে।

(চ) অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের মধ্যে হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করেছে। ফলে হিন্দুরা দুর্বল থেকে দুর্বলতর জাতিতে পরিণত হয়েছে। অন্য ধর্মের লোকেরা হিন্দুদের সততায় বিশ্বাস করে না। এই অবিশ্বাস ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষেও বড় বিপদ। (ছ) যে ধর্ম ইতর প্রাণির পরিবর্তে মানুষকে অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে তা ধর্ম নয়, পাগলামি। অস্পৃশ্যতা মেনে চলে এমন হিন্দুরা কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণিকে ঘরে পালন করে। সেগুলিকে স্নান করায়, তাদের মলমূত্র ফেলে দেয় ড্রেনে। তাতে হিন্দুদের জাত যায় না, জাত যায় অস্পৃশ্য হিন্দুদের গাত্র স্পর্শ করলে। সত্য সেলুকাস, বিচিত্র এই ভারতবর্ষ! (জ) জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের মধ্যে আত্মকলহ বৃদ্ধি করেছে। দেশ বা জাতীয়তাবাদ গঠনে বাধা দিয়েছে। মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। সেই সম্পদকে এই প্রথা ভারতের এক বিরাট অংশকে জাতীয় সম্পদের মর্যাদা দেয়নি। (ঝ) জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা ভারতবর্ষকে একটা অসম-সমাজ উপহার দিয়েছে। তার ফলে এদেশে অসন্তোষ, অশান্তি, ক্ষোভ ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। হ্যারল্ড জে লেস্কির মতে, "An unequal society always lives in fear, and with a sense of impending danger in its heart!" যে কোন অসম সমাজ সর্বদা ভীতির মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করে এবং অন্তরে আসন্ন বিপদের ভাবনা বহন করে চলে। (ঞ) জাত ব্যবস্থার সঙ্গে পেশা ও পেশার সঙ্গে অর্থোপার্জনের ব্যাপারটা জুড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ সমাজ ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক অসাম্যর পীঠস্থানে পরিণত করেছে। বৈশ্যরা যুগ যুগ ধরে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করলেও হিন্দু ধর্মের এব বৃহদংশ তা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। ফলে দেশে আর্থিক লেনদেন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে চলমান থাকায় দেশে আথিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। গান্ধীজি বলতেন, মুচি, কামার, কুমার, কৃষক প্রত্যেকে তার নিজ নিজ পেশায় চিরকাল যুক্ত থাকবে। অন্য পেশা অবলম্বন করলে দেশের ক্ষতি হবে। এই ধারণা চরম ভ্রান্ত। আম্বেদকর অর্থনীতির অধ্যাপক ও গবেষক ছিলেন বলে সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করার কথা দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি চমৎকার একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখান যত বেশি লোক ব্যবসা বাণিজ্য করবে, তত বেশি দেশের তথা অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। যেমন—কোন একটা গ্রামে ১০০ পরিবারের মধ্যে ৪ জন ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন, পাঁচজন লোক ব্যবসা করেন। আর বাকি ৯১ জন লোক কৃষক, মজুর, শ্রমিক, দাস, সর্বহারা ইত্যাদি। ঐ গ্রামে চিরকাল ঐ পাঁচজন ব্যবসায়ী ধনী হবে, চারজন পুরোহিত পৌরোহিত্য করে ভালোভাবে সংসার চালাবেন। অন্যদের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন আসবে না। আম্বেদকরের মতে, ঐ গ্রামের বেশির ভাগ লোক যদি ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, তাহলে তারা জীবন উপভোগ্যের জন্য নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য বেশি পরিমাণে ক্রয় করবে, ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে, বেশি উৎপাদনের জন্য বেশি শ্রমিক লাগবে, উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে

উন্নত হবে। এইভাবে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থার দিকে ধাবিত হবে। তাই পেশা নির্দিষ্ট কতকগুলি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হল দেশকে প্রগতিশীলতার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। আজ আমরা ভারতবর্ষের শহর, গ্রামে, গঞ্জে শূদ্র থেকে শুরু করে সবশ্রেণির মানুষের নানা পেশায় যুক্ত হতে দেখছি, ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি পুষ্ট বা উন্নত হয়েছে। ভারত আজ উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। অতএব গীতায় বর্ণিত, অন্য শাস্ত্রে বর্ণিত ব্রাহ্মণশ্রেণির কথা ও গান্ধীজির পেশাগত চিন্তা গ্রহণযোগ্য নয়, পরিত্যাজ্য। অতএব গান্ধীবাদ অচল। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সব মানুষকে সৎ হতে বলেছেন, কম ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রই প্রকৃত রাষ্ট্র। এই ভ্রান্ত রাষ্ট্রীয় চিন্তাও আজ পরিত্যাগ করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কথা স্মরণীয়—ভারতে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় অতীত ও মধ্যযুগে ভারতে সমুদ্র বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে। ফলে আমাদের দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিও আশানুরূপ হয়নি। এক্ষেত্রে শাস্ত্র ভারতবর্ষকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। (ট) গান্ধীজি কংগ্রেসে যখন অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি হরিজন আন্দোলনে মনোযোগী হন। ড. আম্বেদকরের অস্পৃশ্যদের সপক্ষে আন্দোলনের প্রভাবে কংগ্রেসি রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকা গান্ধীজি নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করার মানসে 'হরিজন' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ খ্রিঃ তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেন। (ঐতিহাসিক অতুল রায়) তাঁর হরিজন আন্দোলন তাঁর মুখোশধারী আন্দোলন। হরিজন সৃষ্টির পেছনে ছিল অদূরদর্শী ও সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল সমাজের দুর্বলতর মানুষকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে চিরতরে তাদের অসহায় করে রাখা। চিরকাল কৃপার পাত্র করে রাখা। আম্বেদকর বলেছেন, গান্ধীজি যদি সত্যই হরিজনদের মঙ্গল বা কল্যাণ চাইতেন, তাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন চাইতেন, তাহলে তিনি কেন তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে, নানারূপ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, পেশাগত বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন না? তিনি তো তখন ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত, ক্ষমতাবান নেতা। আসলে মুখোশধারী গান্ধীজি হরিজন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন। তাই তিনি কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের চিন্তা করেননি। এখন দেখা যাক আম্বেদকর ও গান্ধীজির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনায়।

সাদৃশ্য ঃ

(১) শক্তিমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রে দু'জনই সত্যাগ্রহ অবলম্বন করেন।

(২) দু'জন হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা রূপে দেখতে চেয়েছিলেন।

(৩) ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংহতি ও জাতীয়তাবোধ উন্মেষে ইংরেজদের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন।

(৪) দু'জনই সময়ের মূল্যকে গুরুত্ব দিতেন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান জিনিস হচ্ছে সময়—এটা তাঁরা উভয়েই বিশ্বাস করতেন।

(৫) অবিমিশ্র জড়বাদ মানুষকে পুরোপুরি সুখী করতে পারে না, মানবজীবনে ধর্মের একটা বিশেষ স্থান আছে, এটা দু'জনেই মানতেন।

(৬) দু'জনেই বিশ্বাস করতেন—আগে জাতীয়তাবাদ, পরে আন্তর্জাতিকতাবাদ।

(৭) দু'জনেই লোক চরিত্র বোঝার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। জীবদ্দশায় একমাত্র আম্বেদকর গান্ধীর স্বরূপ এবং গান্ধী আম্বেদকরের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন।

(৮) গান্ধীজি ১৯২২ খ্রিঃ পর্যন্ত চাইতেন—ইংরেজ ভারতবর্ষে থাকুক, আম্বেদকর চেয়েছিলেন ১৯২৯ সাল পর্যন্ত, ১৯৩০ খ্রিঃ থেকে তিনি ব্রিটিশের শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

বৈসাদৃশ্য ঃ সাদৃশ্য অপেক্ষা উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অনেকগুণ বেশি—

(১) গান্ধী বৈষ্ণব ও বেনিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সুলভ মনোভাব ছিল বাইরের খোলস, অন্তরে ছিল কুটিল হিংসা। তিনি রাজনৈতিক জীবনের পদে পদে খোঁজামিলের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নিজেকে সত্যের পূজারী বললেও আসলে হরিজনদের নিয়ে যা করেছেন, তাতে সত্য অপেক্ষা মুখোশ ছিল অনেক বেশি। তাঁর চরিত্রে হেয়ালি ছিল অন্যদিকে নিচুজাতের মাহার, সৈনিক পরিবারে আম্বেদকরের জন্ম হয়। তাই সাসহিসকতা, স্পষ্টবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। স্পষ্টবাদীতার জন্য প্রথমে অপ্রিয় হলেও কালের পরীক্ষায় তাঁর নীতি জয়ী হয়েছে। কর্মজীবনে কোথাও হার মানেনি। বাক্য ও কর্মে হেঁয়ালির কোনও স্থান ছিল না। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী অনেক ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে আম্বেদকরের রাজনীতিতে অহমিকা ও লুকোচুরির কোনও স্থান ছিল না। দেশকালের পরিস্থিতি ও কান্ডজ্ঞানের সংমিশ্রণে তিনি যা সত্য বলে মনে করতেন, তা অকপটে ও লিখিত আকারে বলতেন 'Thoughts on Pakistan' নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে তিনি (১৯৪৩ খ্রিঃ) বলেছিলেন, লোক বিনিময়ের মাধ্যমে ভারত বিভাগ হোক। জিন্নাও তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সেদিন কংগ্রেস ও গান্ধীজির অনমনীয় মনোভাবের জন্য সে প্রস্তাব মানা হয়নি। দেশবিভাগ হবে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে, আবার একটি দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে—এটা আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন না। তাই দেশবিভাগ হোক এবং তা লোক বিনিময়ের মাধ্যমে—এটাই ছিল তাঁর

যুক্তি। তিনি ১৯৪৪ খ্রিঃ উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণেও জোরালোভাবে ওই একই প্রস্তাব রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে দেশবিভাগ হল। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে লোক বিনিময় হলেও পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে সেইভাবে হয়নি বলে আজও উদ্বাস্তু সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অতএব এক্ষেত্রে দূরদর্শী আম্বেদকর, গান্ধীজি বা কংগ্রেস নয়।

(২) অনেকে বলেন মুসলিম লীগ ভারত বিভাজনের জন্য দায়ী। কিন্তু বাস্তব সত্য হল কংগ্রেস এর জন্য দায়ী? আবুল কালাম আজাদ তাঁর "Indian wons Freedom" গ্রন্থে লিখেছেন যে, একদিন জওহরলাল নেহরু তাঁকে (আবুল কালাম আজাদকে) ডেকে বলেন, "We should not indulge in wishful thanking, but face reality. Ultimately, he came to the point and asked me to give up my opposition to partition. He said that it was inevitable and it would not be wisdom what was bound to happen. He also said that it would be not be wise for me to oppose Lord Mountbatten on this issue." অর্থাৎ "বাস্তবকে মেনে নেওয়াই হবে আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। দেশ বিভাগ হবেই। তাই, যা ঘটবে, তা নিয়ে অযথা বাধার সৃষ্টি করা ঠিক নয়। জওহরলাল এটাও বলেন যে, আমি যেন মাউন্টব্যাটেনের দেশবিভাগের ব্যাপারে কোনও বাধা না দেই।" একথার উত্তরে আবুল কালাম আজাদ জওহরলাল নেহরুকে বলেছিলেন, "I warned Jawaharlal that history never forgive us if we agree to partition"—দেশ বিভাগে সম্মতি জানালে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। একবার আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজিকে প্রশ্ন করেন—"কী শুনছি বাপুজি, ভারতবর্ষ নাকি দু'ভাগ হয়ে যাবে?" উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন—"India could only be partition over my dead body alone. So long as I am alive. I will never agree to the partition of India." কিন্তু এটা তাঁর ধাপ্পা বা মিথ্যা কথা। তার প্রমাণ নিম্নরূপ। ১৯৪৭-এর ১৫ জুনে দেশবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস অধিবেশন। এ ব্যাপারে সাংবাদিকরা তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ওয়ার্কিং কমিটি যখন মেনে নিয়েছে, তখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের পক্ষে সে প্রস্তাব গ্রহণ করাই উচিত। তা না হলে সারা পৃথিবীর লোক কী মনে করবে? হয়তো দেশের নেতৃত্ব তখন নতুন লোকের হাতে গিয়ে পড়বে। সেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়।" এই হল ভন্ডদেশনায়ক গান্ধী। আমরা দেখেছি এর পূর্বে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিরোধ হলে এই গান্ধীই অনশনের হুমকি দিয়েছেন, গোসা হয়েছেন। কিন্তু বাংলা বিভাগের প্রশ্নে সহজেই মাথানত করে সমস্ত দায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

আবার বাইরে জনতার সামনে স্বদেশপ্রেমিক হরিজন প্রিয় সাজতে বলেছেন—দেশবিভাগ হবে আমার দেহের উপর দিয়ে। মুখোশধারী নেতার পক্ষে এই দ্বিচারিতাই স্বাভাবিক। এখানে আর একটি কথা বলা দরকার, তা হল, গান্ধী কথিত 'নতুন লোক' কে?" এই নতুন লোকটি হলেন ভারতের আপসহীন দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। কারণ তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় (১৮-৮-১৯৪৫) নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ নিছক একটা রটনা। গান্ধীজি, বল্লভভাই প্যাটেল, নেহরু সকলেই জানতেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন। জনপ্রিয়তায় নেতাজী সমগ্র ভারতবর্ষে অন্যান্য নেতাদের থেকে অনেক, অনেক গুণ এগিয়ে। তাই কোনওভাবে যদি নেতাজী দেশে ফিরে আসেন, তাহলে নেতাজীই হবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এটা হলে গান্ধীজি, জওহরলাল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আসন হবে অনেক নিচে, বা তাঁরা ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে, বহুদূরে ছিটকে পড়তে পারেন। এই ভয়েই তাঁরা দেশবিভাগে সম্মত হন। স্বাধীন ভারতে নেতাজীর মৃত্যু রহস্য ঘিরে যে কয়েকটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে, সেগুলি কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের নির্দেশে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছে। ১৯৫৬ খ্রিঃ শাহনওয়াজ কমিটি, ১৯৭৪ খ্রিঃ খোলসা কমিটি—দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। কিন্তু ২০০৫ খ্রিঃ গঠিত মুখার্জি কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেন, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি, এটা ধ্রুব সত্য। কিন্তু ভারত সরকার তা না মেনে রিপোর্ট খারিজ করে দেয়।

(৩) গান্ধীজি ভারতের রাজনীতিতে সর্বেসর্বা নেতা হবেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেকগুলো মনস্তাত্ত্বিক বিষয় গ্রহণ করেন। ভারতে ঋষি মানেই ঈশ্বরতুল্য, সম্মানীয়, ত্যাগী মহাপুরুষ। তাই তিনি ঋষি হওয়ার জন্য গাত্রে আবরণ ত্যাগ করেন, স্বল্প আহার গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় মন্ত্রোচ্চারণ করেন। বাণী প্রচার করেন। তিনি হিন্দুদের বলতেন, তিনি ঈশ্বরের গুঞ্জন শুনতে পেয়েছেন, ঈশ্বরের নির্দেশলাভ করেছেন ইত্যাদি। এইভাবে প্রশস্তি পেতে ইচ্ছুক গান্ধীজি ধর্মভীরু হিন্দুদের কাছে দেবতা বা ঋষি তুল্য হয়ে ওঠেন। তবে অহিংসার পূজারী গান্ধীজি? ১৯২১ সাময়িক কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বোম্বেতে বিলাতি দ্রব্য পুড়িয়ে হুকুম দিলে তাঁর অনুগামীরা সেই হুকুম পালন করেন। তখন ভারত হিতৈষী এনড্রুজ সাহেব ও রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার নিন্দা করেন। এনড্রুজ সাহেব বলেন, "মানুষের শ্রমের ফসলকে ধ্বংস করা পাপ।" রবীন্দ্রনাথ বলেন, "অতীতকালে আদিম অরণ্যে ঋষিরা তাহাদের সত্যদৃষ্টির প্রাচুর্যে সকলকেই সত্যের অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ... তবে আজ আমাদের গুরু যিনি, তিনি কর্মে আমাদিগকে আহ্বান করেন না কেন? আজ পর্যন্ত গুরু গান্ধীর যে একমাত্র আদেশ দিয়েছেন, তাহা হইল, সুতোকাটা আর কাপড় বোনা। নতুন সৃষ্টির যুগে এই কি তাঁর বাণী।"

পক্ষান্তরে আম্বেদকর রাজনীতির সঙ্গে ঋষিত্ব মিশ্রণের ঘোর বিরোধী। তিনি কালের

ধর্মকে মেনে নিয়ে দায়িত্ব পালন করে সফল হয়েছেন। তিনি একাধারে তাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ও জননেতা হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে দক্ষ প্রশাসক হিসাবেও তুলে ধরেছেন। গান্ধী জননেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পদে পদে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রশাসকের দায়িত্ব তাঁকে কোনওদিনই পালন করতে হয়নি। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "গান্ধী এক অত্যুজ্জ্বল ব্যর্থ নায়ক।" ভারতের দলিতদের মতে তিনি ঘোর তমশা। গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বলেছেন, "যখন ভারতবর্ষের রাজনীতির আলাপ-আলোচনা, শর্ত, চুক্তি প্রভৃতির ইতিহাস লেখা হবে, তখন গান্ধী এক বিরাট ব্যর্থ নায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন হবেন।" পক্ষান্তরে রক্ষণশীলরা আম্বেদকরকে বলেছেন, হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বড় বিপদ; দলিত পন্থার নেতা ভি. টি. রাজশেখরের মতে তিনি গৌতম বুদ্ধের পর মহত্তম ভারতবাসী। দলিতদের কাছে তিনি অস্পৃশ্য সমাজের মুক্তির দূত। গণতন্ত্রী জাতীয় তাবাদীদের মতে, তিনি একজন সুমহান জাতীয় নেতা। দুর্ভাগ্য যে, ভারতের প্রচার মাধ্যম, গুরু, ধর্মধ্বজীরা বর্ণবাদী ঐতিহাসিকরা আম্বেদকরকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে মুখ খোলেননি বা কলম চালাননি।

(৪) গান্ধীজি গীতা ভক্ত, আম্বেদকর গীতাবিরোধী। আম্বেদকর বলেছেন, গীতা মানুষকে নিষ্কাম কর্ম ও ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন ভাবে কাজ করে যেতে বলেছেন। আবার 'গীতামাহাত্ম্য' অংশে গীতা পাঠ করলে বহু শুভফল ফলবে বলে নানা কথা লিখিত আছে। তাই আম্বেদকরের মতে—গীতা স্ববিরোধিতার দোষে দুষ্ট। ১৯৩৭ সালে ১৯ জুলাই বোম্বে বিধানসভায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় সদস্যগণ গীতা স্পর্শ করে আনুগত্যের শপথ নিলেও আম্বেদকর গীতা স্পর্শ না করে এক ভিন্ন পদ্ধতিতে ভাবগম্ভীর পরিবেশে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, গীতায় প্রচারিত ধর্ম মানেই বর্ণাশ্রম ধর্ম, য়া মানবধর্মও নয়। হিন্দু ধর্মও নয়। আম্বেদকর বলেছেন, Gita is an irresponcible book on ethics, a compromise of all errors.—"গীতা নীতিশাস্ত্র বিষয়ক একখানা দায়িত্বহীন পুস্তক, যাবতীয় ভুলের সঙ্গে আপোসকারী।"

(৫) গান্ধীজি ধর্ম, ঈশ্বর, তেত্রিশ কোটি দেবতা অসংখ্য মহাপুরুষে ও পৌত্তলিকতায় আত্মার অস্তিত্বে ও পরজন্মে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে আম্বেদকর বৌদ্ধদের অনাত্মবাদে বিশ্বাসী। তাই দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। গান্ধীর মতে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদ থেকে শূদ্রের উদ্ভব। আম্বেদকর বুদ্ধের সেই মতবাদে বিশ্বাসী—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম এবং চিত্ত বা ভাবনা এই ছটি উপাদানের সমন্বয়ে প্রাণিজগৎ সৃষ্ট। গান্ধীর লক্ষ্য ছিল মৃত্যুর পর মোক্ষলাভ, আম্বেদকরের লক্ষ্য ছিল জীবদ্দশাতেই নির্বাণ লাভ। 'বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণ ইহকালের বিষয়, পরকালের ~~লক্ষ্য~~ নয়।

(৬) গান্ধীজি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করলেও জাতব্যবস্থা ও বর্ণব্যবস্থার অস্তিত্বকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি অস্পৃশ্য হরিজনদের হয়ে লড়াই করলেন, কিন্তু তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলিত করে, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে এনে ব্যক্তিসম্মান, সামাজিক মর্যাদা, পূর্ণমানুষ হিসাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করেননি। আসলে অস্পৃশ্যদের লড়াইয়ের কথা বলে তিনি ভারতবর্ষে মহান হতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল তার মুখোশ, অন্তঃসারশূন্য, বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ, লোকদেখানো নিষ্ফল কর্ম। আম্বেদকর বলতেন উচ্চবর্ণ কখনোই দলিতদের সার্বিক কল্যাণ করতে পারেন না।

পক্ষান্তরে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের শিক্ষিত করতে একটা স্কুল এবং 'সিদ্ধার্থ কলেজ' নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। তিনি ১৯২৩ খ্রিঃ থেকে আমৃত্যু ভারতের দলিত সমাজের শিক্ষাগত, অর্থগত, সম্মানগত, আত্মমর্যাদালাভ সংক্রান্ত ব্যাপারে সারা দেশে মিটিং, মিছিল করেছেন। উচ্চস্বরে বক্তৃতা দিয়েছেন, মানবতার ঘোর শত্রু ব্রাহ্মণ্যবাদ (যা Divide and rule নীতির উদ্ভাবক, ইংরেজরা নয়) ও মানবতা বিধবংসী শাস্ত্র গ্রন্থ বিশেষ করে মনুসংহিতার বিরুদ্ধে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(৭) গান্ধীজি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। হিন্দু ধর্মকে মেনে চলার ক্ষেত্রে যুক্তি অপেক্ষা আবেগতাড়িত হয়ে তিনি চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। গান্ধীর ছোট ছেলে হরিলাল গান্ধী অল্প বয়সেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে আম্বেদকর প্রজ্ঞা, করুনা, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধের উন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে চলতেন। হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি হিন্দুদের কাছে হিন্দু বা সাধারণ মানুষের মর্যাদাটুকু পাননি। তাই উদার অসাম্প্রদায়িক বৌদ্ধধর্মে তিনি ধর্মান্তরিত হন—১৯৫৬-এর ১৫ অক্টোবর। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও আরো তিন লক্ষাধিক মানুষ তাঁর সঙ্গে একই দিনে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

(৮) মানুষ অসমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে—একথা বিশ্বাস করলেও আম্বেদকর মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন। অন্যদিকে গান্ধী বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথার মতো ক্ষতিকারক প্রথাকে ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিয়ে মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখেননি। তিনি কেবল অস্পৃশ্যতার উগ্রপ্রকাশ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতার বাকি সবটুকু সমর্থন করতেন। সমাজের নিচুতলার মানুষকে সহানুভূতিহীন কৃপা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তিনি মানবতাকেই অপমান করেছেন।

(৯) গান্ধী ধর্মকে রাজনীতির ওপর প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ধর্মহল শাশ্বত ও সনাতন। আম্বেদকরের মতে, রাজনীতি গতিশীল। ধর্ম শুধু সমাজ বন্ধন ও সমাজের স্থিতির জন্য। জীবনের প্রতিপদক্ষেপে রাজনীতির গতিশীলতা ক্রীয়াশীল। তিনি বলেছেন,

Neighter god not soul can save the society—ঈশ্বর বা আত্মা কখনো সমাজকে রক্ষা করতে পারে না। অধ্যাপক আবুল ফজল (বিংশ শতাব্দী) তাঁর 'মানবতন্ত্র' প্রবন্ধে অনুরূপভাবে বলেছেন, "ধর্ম বা সেক্যুলারিজম্ কোনোটাই মানুষকে বাঁচাতে পারে না, পারেনি। কাজেই ধর্ম নয়, সেক্যুলারিজম্ও নয়, একমাত্র মানবতার ওপরই জোর দিতে হবে।"

(১০) গান্ধীজি সত্যাগ্রহ (অহিংসার প্রতি আগ্রহ) আন্দোলন পরিচালনা করেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। তাই তাঁকে অনেকে অহিংসার পূজারী বলে পূজা করেন। কিন্তু তাঁদের মনে রাখতে হবে—তাঁর এই সত্যাগ্রহ আসলে ছিল মুখোশধারণ। এর আড়ালে তাঁর অন্তরে ছিল সদা প্রবাহিত হিংসার ধারাস্রোত, যা অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারারন্যায় গতিশীল। তিনি যদি অহিংসার পূজারী হবেন, তাহলে ১৯৩৩ খ্রিঃ-এর পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বসুর জনপ্রিয়তা, তার প্রগাঢ় রাজনৈতিক বুদ্ধি সাংগঠনিক ক্ষমতা, স্বদেশের সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা লক্ষ্য করে গান্ধীজি কেন তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হন, হিংসার আশ্রয় নেন? বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান গান্ধীজি অহিংসার পূজারী হলে বৈষ্ণবের মূলমন্ত্র "তৃণাদপি সুনিচেন, তরুরিব সহিষ্ণুনা'র নীতি গ্রহণ করতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, তিনি ১৯৩৮ খ্রিঃ কংগ্রেসের সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্রকে বসালে গান্ধীজি ক্রুদ্ধ হন। সুভাষচন্দ্রের শিল্পভাবনা, বামপন্থা, রাশিয়ার প্রতি অনুরাগ, ব্যাপক ভূমিসংস্কার, জমিদারি প্রথার বিলোপ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস সরকারগুলির নীতি ইত্যাদি প্রশ্নে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ ঘটে। ১৯৩৯ খ্রিঃ সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির দেওয়া প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে ২০৩ ভোটে পরাজিত করলে গান্ধীজি এই পরাজয়কে তাঁর নিজের পরাজয় রূপে গ্রহণ করেন। গান্ধীজি তখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মন বিষিয়ে তোলেন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এটা কী ধরনের অহিংসার পূজারীর পরিচয়? এছাড়া ড. আম্বেদকরের সঙ্গে নানা সময়ে তিনি হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন। অতএব তার অহিংসার বাণী আসলে ধাপ্পা বা মিথ্যার নামান্তর। ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে তার বার্তায় সুভাষকে সভাপতি পদে ফিরিয়ে নিতে বললেও তিনি তা শোনেননি।

পক্ষান্তরে আম্বেদকর দলিতদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে সরাসরি যা বলার বলতেন, যা করার করতেন, কোনও মিথ্যার ছলনার বা মুখোশের আশ্রয় নেননি।

(১১) গান্ধীজি যৌবনকাল থেকে জীবনের ২/৩ অংশ বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত কামুক ছিলেন। একথা তিনি তাঁর 'আত্মকথা' গ্রন্থে লিখেছেন। "আমার ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা আমার কর্তব্য বুদ্ধিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।" গর্ভবতী স্ত্রীরসঙ্গে যথেচ্ছ সহবাস করার

ফলে—"আমার পত্নীর যে পুত্র হইয়াছিল, সে দুই-চারদিন নিঃশ্বাস লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল।" এছাড়া তিনি নিজে লিখেছেন—বেশ্যাবাড়ি যাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, স্ত্রী সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা, বিড়ি খাওয়া, নানা অপকর্মে ধার নেওয়া টাকা পরিশোধ করতে নিজের ভায়ের সোনার তাগা চুরি করে নিয়ে বিক্রি করা ইত্যাদির কথা। এজন্যই দেবেন ছোট ছেলে হরিলাল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্য পুত্ররা ও স্ত্রী কস্তুর বাঈ তাঁকে সুনজরে দেখতেন না।

মধ্য বয়স পেরিয়ে গেলেও যৌনজীবনে তাঁর সীমাহীন অসক্তি ছিল। অথচ তিনি একে বলেছেন ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা। কংগ্রেসের বহু নেতা বিরক্ত হয়ে বলাবলি করতেন—চার/পাঁচ সন্তানের বাবা হয়ে এই বয়সে আবার ব্রহ্মচর্য পালন কী করে সম্ভব? অ আবার নারীদের ধরতে রাতে শয্যা সঙ্গিনী করে? গান্ধীজির নোয়াখালির সফরের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি অধ্যাপক নির্মল বসু তাঁর 'Last days with Gandhi' নানা পুস্তকে লিখেনে, 'দিনের পর দিন তিনি উলঙ্গ অবস্থায় নারীদের নিয়ে রাত্রি যাপন করার ফলে তারা মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ ৭৭ বছর বয়সে তিনি স্পর্শ সুখ অনুভব করলেও শৃঙ্গার সুখ অনুভব করতে পারতেন না, অন্যদিকে নারীদের যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলেও তা গান্ধীজির কাছ থেকে তৃপ্ত হয়নি। ফলে তারা মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, মূর্চ্ছা যেত মাঝে মাঝে। তিনি নিজের নাতনি মনুর সঙ্গে একই আচরণ করায় সে বলে—'দাদু তুমি আমাকে শেষ করে দিয়েছ।' এখন প্রশ্ন হল—এসব কথা জেনেও কংগ্রেসী নেতারা চরম বিরুদ্ধচরণ করেননি কেন? উতর হল—গান্ধী মিথ! গান্ধী তখন ঋষি, নবী, মহাপুরুষ। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অনেক কিছু মেনে নিতে না পারলেও পদের মোহে কিছুই বলেননি।

পক্ষান্তরে আম্বেদকারের চরিত্র ছিল শুদ্ধ, পবিত্র। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস বা অন্যদলের বা সাধারণ মানুষও এ বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর রোগগ্রস্ত অবস্থায় আম্বেদকর বোম্বের এক হসপিটালে চিকিৎসার জন্য যেতেন। সেই ডাক্তার ছিলেন ব্রাহ্মণ কন্যা সারদা কবীর। তাঁকে তিনি ১৯৪৮ খ্রিঃ ১৫ এপ্রিল বিবাহ করেন।

(১২) গান্ধীজির মতে রেল, স্টীমার, হাসপাতাল নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এগুলো মানুষকে পাপের জগতে নিয়ে যায়। বৈদ্যুতিন আলো, যন্ত্রের ব্যবহার, কেন্দ্রীকরণের বিরোধী গান্ধীজি বলতেন, বিজ্ঞানের আবিষ্কার আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। পক্ষান্তরে আম্বেদকর মনে করতেন, বিজ্ঞান মানবজীবনে আশীর্বাদ, রেল, স্টীমার, আধুনিক চিকিৎসা ও প্রগতির সূচনা করে। যন্ত্র মানুষকে পশুজীবন থেকে মুক্ত করে সমৃদ্ধিশালী জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

(১৩) গান্ধীজি পেশাগত নীতিকে সমর্থন করে বলতেন বংশগত পেশার নীতি শাশ্বত,

এটার পরিবর্তন মানে সমাজে বিশৃঙ্খলকে ডেকে আনা। অন্যদিকে আম্বেদকরের মতে, পেশার সঙ্গে জাতি বিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। পেশা নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিগত দক্ষতা, ক্ষমতা ও রুচির ওপর। তাই ব্যক্তিগত দক্ষতা, ক্ষমতানুযায়ী মানুষ পেশা বেছে নেবে, এটাই স্বাভাবিক।

(১৪) গান্ধী আদর্শবাদী। অহিংসা তাঁর আদর্শবাদের মূল স্তম্ভ। কিন্তু এই অহিংসার নীতি আসলে তাঁর গোঁড়ামি মন্ত্র। অন্যদিকে আম্বেদকর প্রখর বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী, তাঁর মন ও মস্তিষ্কের পরিধি বিশাল। তিনি শুষ্ক আদর্শ ও অহিংসার গোঁড়ামিতে বিশ্বাসী নন। কার্লমার্কস, জর্জ বার্নাডশ, বীর সাভারকার, বুদ্ধের জীবনী ও বাণী পাঠ করে তাঁর জীবনদর্শন গড়ে তোলেন। তিনি জীবনে ধূমপান ও মদ পান করেননি। তাঁর জীবনের বড় tragedy হল—তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, তা এদেশের রক্ষণশীল সমাজ বুঝতে পারেনি, তাই তা করতে দেয়নি। তাঁর যোগ্যতার মূল্যায়নের কোনও চেষ্টা তাঁরা করেননি। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পরে তাঁকে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া হয়।

(১৫) গান্ধীজি নিজে বেনিয়া পরিবারের সন্তান হওয়ায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁকে ভারতের বিত্তবানরা আর্থিক সহায়তা করায় তিনি সারাজীবন তাঁদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতেন, মালিকরা নিজেদের সম্পদ নিজেরা ভোগ করবেন। তারা কেবল দারিদ্রদের তত্ত্বাবধায়ক হবেন। অন্যদিকে আম্বেদকর বলেছেন, বিত্তবান শ্রেণি অত্যধিক ধনলিপ্সা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা জগতকে মেহনতি মানুষের পক্ষে এক অশ্রুসিক্ত বিষাদ প্রান্তরে পরিণত করেছে। তাঁরা জোর করে তাঁদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে আইন প্রণয়ন করে।

(১৬) গান্ধী ধর্মান্ধ হওয়ায় সামাজিক শক্তির সন্ধান করেছেন ধর্মের মধ্যে। আর বিজ্ঞানে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদ আম্বেদকর সামাজিক শক্তির সন্ধান করেছেন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে। আম্বেদকরের মতে, একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়েও ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে। তাঁর মতে, ধর্মে বিশ্বাস মানে নৈতিকতা, মানবতা ইত্যাদি।

(১৭) মুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ যদি সারাদেশের মানুষকে শোষণ করে নিজেদের ভোগের জন্য পাহাড় প্রমাণ ধন আত্মসাৎ করে অথবা কিছু ধর্মগুরু, পুরোহিত ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কোটি কোটি সরল মানুষকে ফাঁকি দিয়ে, শোষণ করে বিত্তবান হয়ে ওঠে, গান্ধীর মতে তাতে কোনও দোষ নেই। পক্ষান্তরে আম্বেদকরের মতে, দেশের নিরক্ষর, দরিদ্র জনগণকে শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ করে দিয়ে তাঁরে অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য, নিরাপত্তা বিধান করা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(১৮) গান্ধীজি খোলাখুলি আলোচনা অপেক্ষা গোপনে আলোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই দেখা যায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের দিনগুলিতে মুসলিম নেতা আগা খাঁর সঙ্গে

গোপনে পরামর্শকালে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে আগা খাঁকে অনুরোধ করেছেন, মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেন আম্বেদকরের দাবিকে কোনওভাবেই সমর্থন না করেন। অন্যদিকে আম্বেদকর গোপনীয় পরিত্যাগ করে গান্ধী, নেহরু, জিন্না প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকতেন, আলোচনার সুযোগ না মিললে পত্র/পুস্তিকায় লিখিত মতামত ব্যক্ত করতেন।

(১৯) বুর্জোয়া শ্রেণির লোক গান্ধী বুর্জোয়াদের প্রচার যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে তাঁর মতবাদ, ধর্ম, দার্শনিকতা সব কিছুই প্রচার করেছেন। সহজেই জনমনে স্থান পেয়েছেন। অন্যদিকে নিচুতলার মানুষ বলে আম্বেদকরের পক্ষে প্রচার যন্ত্র ছিল না, বরং তাকে কালিমালিপ্ত করতে তৎকালীন প্রচারযন্ত্র সদা সচেষ্ট ছিল। তাই তখন এবং আজও আম্বেদকরের গুণাবলি, বহু বিষয়ে ডক্টরেট, ডি.লিট. বার-এট-ল ইত্যাদি ডিগ্রী অর্জনের কথা, তাঁর গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, কার্লমার্কস-এর শ্রেণি সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রতি ভক্তি, ব্রাহ্মণ্যবাদের কুফল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, তাঁর রচিত প্রায় ৩৫টি বিখ্যাত গ্রন্থের কথা ভারতবাসীর খুব কম লোকই জানেন।

(২০) জীবিত গান্ধী যতটা জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ছিলেন, মৃত গান্ধী সে তুলনায় নিষ্প্রভ। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদগুলি ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগছে না। তিনি কেবল গবেষকদের ডিগ্রী অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁর বাণী আজ কেউ মানেন না। অন্যদিকে জীবিত আম্বেদকর অপেক্ষা মৃত আম্বেদকর অনেক বেশি শক্তিশালী, প্রকট তাই আজ ভারতের ৭৯ শতাংশ লোক তাঁর জীবন দর্শনকে আঁকড়ে ধরে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে কাশীরামজী ও তাঁর মানসকন্যা মায়াবতী তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(২১) গান্ধী ছিলেন ব্রিটিশের অন্ধ ভক্ত। তাই দেখা যায়—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন ইটালির ফ্যাসিবাদ ও জার্মানির নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিরক্ত গান্ধীজি ১৯৩৯-এর ৯ সেপ্টেম্বর বললেন, এ যুদ্ধে আমার সহানুভূতি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের দিকে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা আমি মোটেই ভাবছি না। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স যদি স্বাধীনতা হারায়, তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিয়ে কী হবে? এই কারণে অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেছেন, আসলে তিনি ছিলেন ব্রিটিশের চর। গান্ধীজি নিজে বড় নেতা বা ভারতের সবার উচ্চ আসন লাভ করার জন্য মুখোশধারণ করে রাজনীতি করেছেন। আন্দোলন যখনই হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে, ইংরেজ যখন কোণঠাসা হয়ে উঠেছে, তখনই তিনি আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই ইংল্যান্ডের মন্ত্রী Ellen Wilkenson বলেছেন, Gandi won the best policeman the British in India : মাইকেল এর্ডওয়ার্ডস তাঁর The Last Years of British India গ্রন্থে লিখেছেন,

গান্ধীজির কাছ থেকে ইংরেজদের ভয় পাওয়ার কিছুই ছিল না। তাঁরা তাঁকে কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতা বিরোধী একজন সংস্কারক হিসাবেই দেখতেন। অন্যদিকে আম্বেদকর ছিলেন ইংরেজ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ—এ দুয়েরই বিরোধী, তিনি ছিলেন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের ভক্ত। তিনি বলতেন, সমগ্র মানব সমাজ শোষক ও শোষিত—এই দু'ভাগে বিভক্ত। ইংরেজ ভারতীয়দের কাছে শোষক। তাই তারা ভারতের শত্রু। তিনি ব্রাহ্মণকে নয়, ঘৃণা করতেন ব্রাহ্মণ্যবাদকে। তিনি চাইতেন—দলিতরা উচ্চবর্ণদের মতো সম্মানীয় হোক, এটাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি দলিতদের শিক্ষাগত ও আর্থিক দিকেও উন্নত হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। গান্ধীজি দেখতেন কেবল উচ্চবর্ণের স্বার্থ। হরিজন আন্দোলন ছিল তাঁর ভন্ডামি।

গণ-পরিষদের নির্বাচন ও সংবিধান রচনা ঃ ক্যাবিনেট মিশনের (মন্ত্রী মিশন) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে-র প্রস্তাব অনুসারে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা গণ-পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৬-এর জুলাই-আগস্ট মাসে গণ পরিষদের ২৯৬ জন সদস্য নির্বাচিত হন। ড. আম্বেদকর যাতে গণ-পরিষদের সদস্য হতে না পারেন, কংগ্রেস ও উচ্চবর্ণের নেত্রীবৃন্দ সেদিকে কড়া নজর রাখেন। বোম্বাই আইন পরিষদে তপসিলী ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ছিল কম। তাই সেখান থেকে আম্বেদকরের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে তপসিলী ফেডারেশনের ওয়ার্কিংকমিটির সদস্য ও বিখ্যাত জননেতা পূর্ববাংলার বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের আমন্ত্রণে আম্বেদকর অবিভক্ত বাঙ্গদেশ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এই সময় প্রাক্তন মন্ত্রী ও অন্যতম বিখ্যাত তপসিলী নেতা মুকুন্দবিহারী মল্লিক গণ-পরিষদের সদস্য হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যোগেন মন্ডলের প্রচেষ্টায় তাঁর স্থলে আম্বেদকরকেই মনোনীত করা হয়। মনোনয়নপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন খুলনার মুকুন্দবিহারী মল্লিক, ফরিদপুরের দ্বারিকানাথ বারুই, ময়মনসিংহের গয়ানাথ বিশ্বাস, রঙপুরের নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও ক্ষেত্রনাথ সিংহ। মুকুন্দবিহারী মল্লিকও সই করেন। অতি সক্রিয় নবীন কর্মীদের মধ্যে সই করেন অপূর্বলাল মজুমদার, নীলকমল সরকার, চুনীলাল বিশ্বাস, যোগেন্দ্রনাথ হালদার। মহিলা কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষকুমারী তাকুলকার, বীণা সমাদ্দার, শ্রীমতী সুষমা মৈত্র (সরকার) প্রমুখ। আম্বেদকর পূর্ববাংলার থেকেই নির্বাচিত হয়ে গণ-পরিষদে যান।

১৯৪৬-এর ৯ ডিসেম্বর নিউদিল্লির 'Constitution Hall'-এ বেলা ১১টায় গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের প্রথম দিনে ড. আম্বেদকর এমন এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন যে, পরিষদের আবহাওয়াটাই পাল্টে যায়। তাঁর ওপর অনেক দায়িত্ব বর্তায়। ৮ মাস পরে চতুর্থ অধিবেশনে (১৪ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই)

ভারতের জাতীয় পতাকা কেমন হবে, সেই আলোচনায় গান্ধীজি প্রস্তাব রাখেন—পতাকা চরকাশহিত তেরঙ্গা হবে। কিন্তু ড. আম্বেদকর ফ্ল্যাগ কমিটির সদস্য হিসেবে মহামতি অশোকের 'অশোকচক্র' রাখার প্রস্তাব দিলে তাই গৃহীত হয়। এই ৭-৮ মাস ধরে আম্বেদকরের বক্তৃতা ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করে মুগ্ধ জওহরলাল নেহরু অবশেষে ১৯৪৭-এর ৩ আগস্ট আম্বেদকরকে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। ড. আম্বেদকর চিরকাল কংগ্রেসী রাজনীতির বিরুদ্ধে থাকলেও কেবল ভারতের দলিতদের স্বার্থ রক্ষার মানসে নেহরুর মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ৪ বছর ৩ মাস ২৬ দিন নেহরু মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্বকরার পর হিন্দু কোড বিল নিয়ে বিতর্কে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে মন্ত্রী পদ ত্যাগ করেন (১৯৫১-এর ২৭ সেপ্টেম্বর)।

এরপর মূল সংবিধান লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন সংবিধান রচনার জন্য জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ স্যার আইভর জেনিংসের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজি প্রস্তাব মতো এই মহতি কর্মে ড. আম্বেদকরকে নিযুক্ত করা হয়। এজন্যই গণ-পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনের শেষ দিনে (১৯ আগস্ট ১৯৪৭) সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি (Drafting Committee) গঠন করা হয় এবং ড. আম্বেদকরকে এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গাকার, আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে. এম. মুন্সী, সৈয়দ মহম্মদ শাহেদুল্লা, বি. পি. খৈতান ও বি. এল. মিত্র। দীর্ঘ ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন পর সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত হয়। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকরী হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংবিধানের প্রকৃতি নির্ভর করে রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্রের ওপর। ভারতবর্ষের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ছিলেন বিলেত থেকে ডিগ্রীধারী, ভারতের বেনিয়া, উচ্চবর্ণ, উচ্চবিত্ত, বিভিন্ন রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল বেনিয়া উচ্চবিত্তদের স্বার্থ চরিতার্থ করা। অন্যদিকে আম্বেদকর ছিলেন আজীবন কংগ্রেস বিরোধী এবং দলিত স্বার্থ চরিতার্থের সপক্ষে। তাই সংবিধান রচনার সময় ও পরবর্তীকালে সংশোধনীর সময় সংবিধানে আম্বেদকরের চিন্তাভাবনার মতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি, কিছুটা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গণ-পরিষদের সদস্য ড. পাঞ্জাবরাও দেশমুখ বলেছেন—'আম্বেদকরের যদি সুযোগ থাকত তাহলে সংবিধান হতো ভিন্ন চরিত্রের।' বস্তুত তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সংবিধানের বহু ধারা উপধারা বর্জন করে বিত্তবানদের স্বার্থরক্ষাকারী সংবিধানে পরিণত করা হয়েছে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বিল নিয়ে রাজ্যসভায় আম্বেদকরের সমালোচনার উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাশনাথ কাটজু আম্বেদকরকে বলেছিলেন, 'আপনিতো সংবিধান লিখেছেন।' তাঁর

প্রত্যুত্তরে আম্বেদকর বলেছিলেন, 'সংবিধান রচনায় আমি ছিলাম পেশাদার ভাড়াটে লেখক মাত্র। আমাকে যা করতে বলা হয়েছিল, আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাই করেছিলাম।... আমিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই সংবিধানকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাই। এ সংবিধান সাধারণ লোকের সার্বিক কল্যাণ করতে পারে না।' একথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আম্বেদকর চেয়েছিলেন রাষ্ট্র হবে **সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র** সমাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষের সুখ-শান্তি ও সুবিধা দেখা যায়, আর গণতন্ত্র তো শ্রেষ্ঠ তন্ত্র। তিনি একদিন এক জনসভায় বলেছিলেন, মার্কসবাদ মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষাকে দমন করার কথা বলে। রাশিয়া যেভাবে ইউরোপের দেশগুলিকে কুক্ষিগত করতে শক্তি প্রয়োগ করছে, তাতে একদিন খারাপ ফল ফলবে। রাশিয়ার মার্কসবাদ ৮০-৯০ বছরের বেশি স্থায়ী হতে পারে না। দূরদর্শি আম্বেদকরের কথাই ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ১৫ খণ্ডে বিভাজনের মধ্যে দিয়ে সত্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ড. আম্বেদকর এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—'১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমরা এক বৈপরীত্যময় জীবনে প্রবেশ করতে চলেছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের থাকবে সমতা, ... আর অসমতা থাকবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমাদের এই বৈপরীত্য দূর করতে হবে, নইলে এই অসমতার শিকার যারা, তারা এত পরিশ্রম করে এই সংশোধের যে গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করেছে, তাকে উড়িয়ে দেবে।' সত্যই ভারতের সকলে ভোটদানের মতো রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা তারা পায়নি। তাই এদেশে দলিত নির্যাতন, ছোটবড় ভেদাভেদ, অসবর্ণ বিবাহকে কেন্দ্র করে খুনোখুনি, সম্মান-কৌলিন্য রক্ষার্থে ভিন্ন জাতের প্রেমিক-প্রেমিকাকে আজও জীবন দিতে হচ্ছে। আজও ভারতের ৩০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। তারা দৈনিক ১৪ টাকায় জীবন অতিবাহিত করছে।

১৯৫১-৫৬ পর্যন্ত আম্বেদকরের কার্যাবলি ঃ ১৯৫১-এর ২৭ সেপ্টেম্বর আম্বেদকর নেহরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু ১৯৫২-এর মার্চ মাসে পি. এন. রাজভোজের চেষ্টায় রাজ্যসভায় তিনি সদস্যরূপে মনোনীত হন। এবারও তিনি হিন্দু কোড বিল পাস করানোর জন্য রাজ্যসভায় শোরগোল ফেলে দেন। এই বিল ছিল ভারতীয় নারীজাতির মুক্তির পথ। এই সময় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আম্বেদকরকে Dr. of Law ভূষিত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইসেন হাওয়ার তার হাতে মানপত্র তুলে দেন। অথচ এতদিনে ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কোনরূপ সম্মান জানাননি বলে সিদ্ধার্থ কলেজের অধ্যক্ষ ড. ভি. এস. পতঙ্গসহ অনেকেই খেদ প্রকাশ করেন। এটা উচ্চবর্ণের পণ্ডিতদের মানসিক অনুদারতা বলে উল্লেখ করা হয়। তবে ১৯৫৩-এর ১২ জানুয়ারি হায়দ্রাবাদের

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আম্বেদকরকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধি দান করেন। এটাই হল দেশের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম উপাধি দান। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝিতে আম্বেদকর রাজ্যসভায় 'অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন' সম্পর্কে বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন, অস্পৃশ্যতা ব্যাপারে অপরাধ করলে অপরাধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হোক। রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে আম্বেদকর নেহরুর পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা করে বলেন, মার্কসবাদ ও গণতন্ত্রের সহাবস্থানের নীতি সোনার পাথরবাটির মতো অসম্ভব ব্যাপার। নেহরু সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সমগ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। এই সময় চীন তার সীমান্তবর্তী তীব্বতকে গ্রাস করলে আম্বেদকর রাজ্যসভায় বললেন, মাও-সে-তুং-এর তীব্বত নীতি ভারতকে গ্রাস করবে না তো? আম্বেদকর যে দূরদর্শি ছিলেন, তার প্রমাণ এর মাত্র ৭-৮ বছর পরে চীন ভারত সীমান্ত আক্রমণ করে। তিনি আর্থসামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে বলেন, তপসিলী জাতি, উপজাতি কমিশনারের উচিত সংবিধান সংশোধন করে ভারতের সমস্ত অনাবাদী পতিত জমি রেকর্ড করে সরকারি অধিগ্রহণের পর ভূমিহীন তপসিলী জাতি, উপজাতি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া। গত শতাব্দীর সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই নীতি প্রয়োগ করে গ্রাম বাংলায় সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

আম্বেদকরের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ঃ ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ভারতছাড়ো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নির্দেশে ভারতের বড়লাট লর্ড লিন লিথ গো কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আম্বেদকর তখন বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে এর বিরোধিতা করেন। অন্যান্য ভারতীয় সদস্যরা বড়লাটের ঘোষণাপত্রে সই করলেও কেবল আম্বেদকরই সই না করে বলেন যে, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতার জন্য এই আন্দোলন করছেন। সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল না বলে বড়লাট নেতাদের গ্রেপ্তার করে ভারতের নৈনিতাল, পুনা, আহমেদনগরের জেলে রাখেন। এতে আম্বেদকরের জাতীয়তাবাদী ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। (ii) ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হলে দিল্লি সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ রটে যায় যে, হায়দ্রাবাদে মুসলিমরা জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করছেন। আম্বেদকর তখন এক বিবৃতিতে বলেন যে, তপসিলীরা যেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ না করেন। তাঁর এই কথায় ভারতের বেশিরভাগ সংবাদপত্র তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জাতীয়তাবাদী নেতা আখ্যা দেন।

আম্বেদকরের গ্রন্থাবলী ঃ আজীবন সংগ্রাম মিটিং মিছিল করেও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী ও পুঁথিকীট। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল ভারতের

শ্রেষ্ঠ ও বড় লাইব্রেরি। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল—জাতপাতের মুলোৎপাটন, ফেডারেশন বনাম স্বাধীনতা, পাকিস্তান নিয়ে ভাবনাচিন্তা, গান্ধী এবং অস্পৃশ্যদের মুক্তি, রানাডে, গান্ধী এবং জিন্নাহ্, সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা আর তাঁর সমাধানের উপায়, রাষ্ট্র তথা সংখ্যালঘু মানুষ, বুদ্ধ এণ্ড হিজ ধম্ম, ভাষাভিত্তিক রাজ্যের উপর তাঁর মতামত।

এসব ছাড়াও আছে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সম্ভার যে সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণাই প্রকাশ করেছে। যেমন—ভারতের জাতব্যবস্থা, ভাষাভিত্তিক রাজ্য হিসেবে মহারাষ্ট্র, নীড় ফর চেকস্ অ্যাণ্ড ব্যালান্স, সাউথ বরো কমিটিতে সাক্ষ্যদান, স্মল হোল্ডিং ইন্ ইণ্ডিয়া, মিঃ রাসেল অ্যাণ্ড দ্য রিকন্‌স্ট্রাকশন অব সোসাইটি, বম্বে বিধানসভায় ড. আম্বেদকর, সাইমন কমিশনের সঙ্গে ড. আম্বেদকর, গোল টেবিল বৈঠকে ড. আম্বেদকর, হিন্দুধর্মের দর্শন, রেভুলিউশন্ অ্যাণ্ড কাউন্টার রেভুলিউশন্, রিড্‌লস্ ইন হিন্দুইজম্, আনটাটাবল্‌স অর দ্য চিলড্রেন অব ইণ্ডিয়ান ঘেটো, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ অ্যাণ্ড ফাইনান্স অব দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, দ্য এভুলিউশন্ অব প্রভিন্সিয়াল ফাইনান্স ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, টাকার সমস্যা, শূদ্র ছিলেন কারা, পাকিস্তান,—বা ভারত বিভাগ? ('পাকিস্তান নিয়ে ভাবনা চিন্তার' বর্দ্ধিতরূপ), সোর্স ম্যাটেরিয়াল্‌স্, কংগ্রেস এবং গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছেন?, অ্যান্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান কমার্স, কমার্শিয়াল রিলেশনস্ অব ইণ্ডিয়া ইন দ্য মিডল ইস্ট, ইণ্ডিয়া অন দি এভ অব দি ক্রাউন গভর্ণমেন্ট, আনটাচাবল্‌স্ অ্যাণ্ড পাক্স ব্রিটানিয়া, ইংলিশ্ কন্‌স্টিটিউশন ও প্যারামাউন্টসি টু দ্য ক্লেইম অব ইণ্ডিয়ান স্টেটস টু বি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট।

আম্বেদকরের অবদান ঃ ১। ভারতীয় দলিতরা রাজনৈতিক (ভোটাধিকার) লাভ করেন। ২। দলিতরা চাকরিতে সংরক্ষণের অধিকার পেয়ে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির মুখ দর্শন করেছে। ৩। উচ্চবর্ণের সামাজিক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অত্যাচারের হাত থেকে বহুলাংশে মুক্তি পেয়েছে, যদিও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। ৪। দলিতরা সর্বক্ষেত্রে না হলেও অফিস আদালতসহ নানা ক্ষেত্রে নানা সংগঠন গড়ে তুলেছে। ৫। দলিতদের অনেকে রাজনীতির মঞ্চে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ইত্যাদি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ৬। সংবিধানে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে "Untouchability is a crime against God and man" এই বাক্যটি সংযোজিত হয়েছে। ৭। অস্পৃশ্যরা মন্দিরসহ জনসাধারণের ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছে। ৮। OBC রাও সংবিধানের ৩৪০ নং ধারা অনুসারে শিক্ষা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন, যা আম্বেদকরেরই অবদান। ৯। সংবিধানে ড. আম্বেদকর ১৫(৪), ১৬(১), ১৯(১), ১৬৪(১), ২৭৫(১), ৩৩০(১), ৩৩৫, ৩৩৮(১) ইত্যাদি ধারায় তপসিলী উপজাতিদের নানা বিষয়ে সুযোগ-সুবিধাদানের কথা বলা হয়েছে।

পরিশেষে ননীগোপাল বিশ্বাস ও রেণুকা বিশ্বাসের গান্ধী ও আম্বেদকর গ্রন্থে যা বলেছেন, তা তুলে ধরি—"গান্ধী ভক্তিবাদী, আম্বেদকর যুক্তিবাদী। গান্ধী বর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি, আম্বেদকর দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি। গান্ধী কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাই তিনি বলেছেন, বিহারে ভূমিকম্প হয়েছে তাদের পাপের জন্য। আম্বেদকর প্রজ্ঞাশ্রয়ী, গান্ধী যুগের ধর্মকে অস্বীকার করেছেন, আম্বেদকর যুগের দাবিকে স্বাগত জানিয়েছেন। গান্ধী ইতিহাস পাঠ করে শিক্ষা নেননি, আম্বেদকর ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। গান্ধী ধনবৈষম্যকে বিধির বিধান হিসাবে দেখেছেন, আম্বেদকর তাকে ধূর্তদের অমানবিক ক্রিয়ার ফল হিসাবে দেখেছেন। গান্ধী ২০ শতাংশ মানুষের স্বার্থ পূরণে সচেষ্ট ছিলেন, আম্বেদকর ৮০ শতাংশ মানুষের স্বার্থ উন্নয়নে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। গান্ধী একজন মহারাজার দেওয়া 'মহাত্মা' আখ্যা পেয়েছেন, আম্বেদকর নির্যাতিত মানুষের দেওয়া বাবা সাহেব আখ্যা পেয়েছেন। গান্ধী ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গডসের গুলিতে নিহত হন, আম্বেদকর ভুল ওষুধ প্রয়োগে প্রাণ হারান (১৯৫৬-এর ৬ ডিসেম্বর)।

আম্বেদকর রচিত সংবিধানের বহু ধারা, উপধারা গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা বাদ দিয়ে যে নতুন সংবিধান রচনা করেন। তাতে বড়লোকের উপকার হবে বেশি, গরিব লোকের নয়। তাই একদিন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এই সংবিধান পুড়িয়ে ফেলা হোক। তাঁর আন্দোলনের ফলে ভারতীয় নারীরা পেয়েছেন তাদের প্রাপ্য সম্মান। OBC ও SC/ST-রা পাচ্ছেন তাঁদের সম্মান, অস্পৃশ্যতাকে ঈশ্বরের ও মানুষেণ পক্ষে অপরাধ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। যাইহোক দলিত সমাজের এই মোজেস, মুক্তিদাতা, প্রমিডিস আনবাউন্ড কর্ণের মতো বঞ্চিতের ও হতাশার দলের নায়ক, গ্রন্থকীট, জীবনের ৭৫ শতাংশ সময় অধ্যয়নে রত। ১৪/১৫ খানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা তৎকালীন এশিয়ার ৬ জন পণ্ডিতের অন্যতম ড. বি. আর. আম্বেদকরের চিন্তা-আদর্শের রথচক্র চির গতিশীল থাকুক, তাঁর যথার্থ মূল্যায়নে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, মুসলিম, বৌদ্ধ সবাই এগিয়ে আসুক—এটা আমাদের সকলেরই কাম্য।

উপসংহার ঃ ধর্মের নামে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা এদেশের সমাজকে খন্ড খন্ড করে মানুষকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শাসন-শোষণ, অত্যাচার চালিয়ে আসছিল, তার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ৫৬৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কপিলাবস্তু নগরের রাজপুত্র সিদ্ধার্থ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ। এরপর প্রায় ২০০০ বছর পরে প্রেমাবতার চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নিচুতলার মানুষকে আপন বলে বুকে টেনে নিয়ে সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। আর তৃতীয়স্তরে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সাধারণ মানুষসহ ভারতে চির অবহেলিত নারী জাতির ভাগ্যোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর বিবেকানন্দ গত শতাব্দীর শেষ দিকে

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও বেলুড়ে মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার করার সময় থেকে 'পুনর্মূষিকভব' হলেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক-বাহক হয়ে উঠলেন। তিনি নিচুতলার মানুষের হয়ে কিছু ভালো ভালো বাণী দিয়েছিলেন মাত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিগত সাড়ে তিন হাজার বছরে আবির্ভূত দশাবতার, বহু গুরু, ধর্মবেত্তা, ভগবান, তেত্রিশ কোটি দেবতা, তথাকথিত মহামানব—এঁদের কেউ-ই মানুষকে স্বর্গে স্থান দেওয়ার কথা বাদ দিয়ে পৃথিবীতে মানবিক সম্মান নিয়ে, দু-মুঠো শান্তির অন্ন ভক্ষণ করে বেঁচে থাকার কথা বলেননি। সর্বশেষে ড. বি. আর. আম্বেদকরই ভারতের মৃতপ্রায় ৮৫ শতাংশ নিম্নবর্ণের মানুষের মুক্তিদাতা, অন্নদাতা, মুখে স্পর্ধিত ভাষা ফোটানোর কারিগর। তিনি মোজেসের বা প্রমিথিউস আন বাউন্ডের ভূমিকা পালন করে তাঁদের মুক্তির দূত হয়ে উঠলেন। আজও ড. আম্বেদকরের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। গান্ধীজির মূল্যায়ন যা হয়েছে, তাও সার্বিক নয়। তাই এঁদের সার্বিক পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

তথ্যচয়নে সহায়ক গ্রন্থ তালিকা ঃ

১। হিন্দু স্বরাজ্য—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

২। ড. আম্বেদকর লাইফ অ্যান্ড মিশন—ধনঞ্জয় কীর

৩। Gandhi and Gandhism — Dr. Ambedkar.

৪। Doctor Ambedkar's role in National Movement — Dr. D. R. Jatava

৫। বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ড. আম্বেদকর — রণজিৎ কুমার সিকদার

৬। জাতীয় নেতা ড. আম্বেদকর — নীতীশ বিশ্বাস

৭। গান্ধীজির অপকর্ম — অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

৮। দলিত সমাজ ও আম্বেদকর — অতীত ঘোষ

৯। গান্ধী ও আম্বেদকর : তুলনামূলক সমীক্ষা — ননীগোপাল বিশ্বাস ও রেণুকা বিশ্বাস

১০। ইতিহাস (বি.এ. ক্লাসের পাঠ্য) — অতুলকৃষ্ণ রায়, প্রভাতাংশু মাইতি, কিরণ চৌধুরী, সমর মুখার্জি, কল্যাণ চৌধুরী প্রমুখ

১১। নেতাজী সুভাষ সমগ্র (জীবন ও রহস্য) অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

১২। আত্মকথা — মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

১৩। এদেশের রাজনীতি ও বহুজন সমাজ — শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস।